KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর ওবায়দ
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫১/৫ ৫১/৬ ৫১/৭ ৫১/৮	Year of Publication ভাদ্র ১৩৯৭ || Sep 1990 আশ্বিন ১৩৯৭ || Oct 1990 কার্তিক ১৩৯৭ || Nov 1990 অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ || Dec 1990
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No KLMLGK

হুমায়ূন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৬ অকটোবর ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

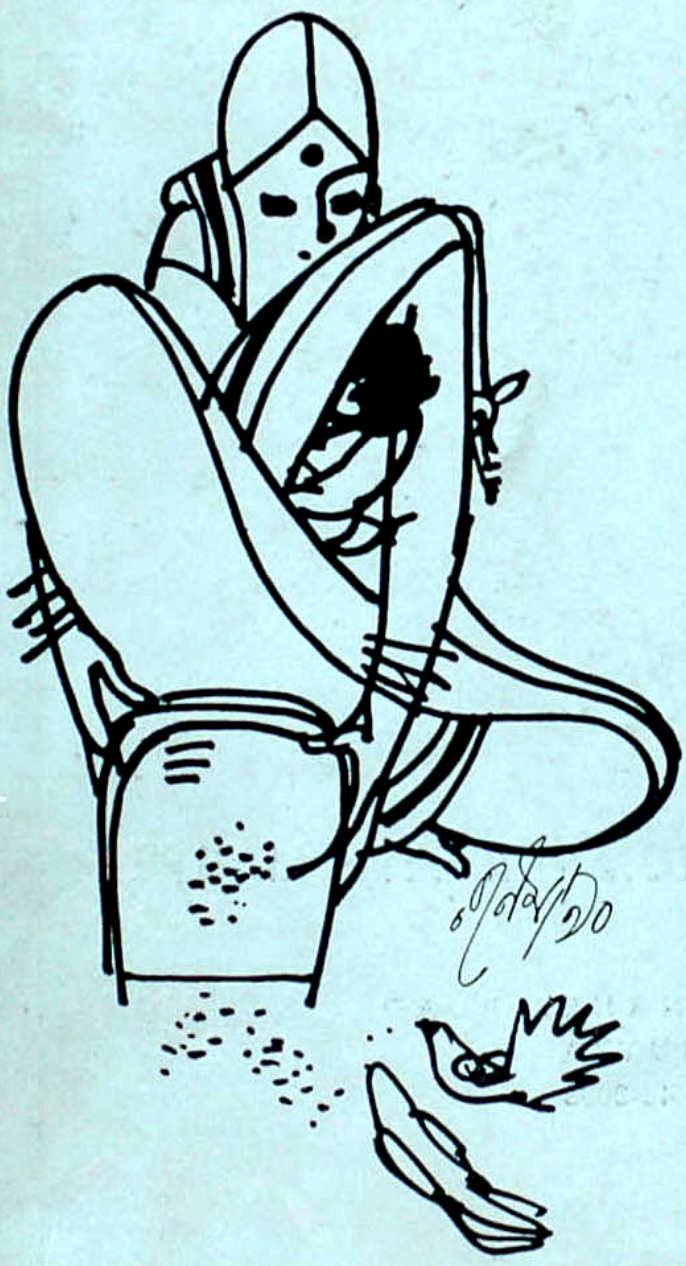

বহুজাতিক সংস্থাগুলি কিরকম বিচিত্র কৌশলে ভারতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে এর থেকে ফায়দা ওঠাচ্ছে সেই প্রক্রিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড. ভবতোষ দত্ত।

ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণের আবেগকে উজ্জীবিত করা কতখানি জরুরি? ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পুলকনারায়ণ ধরের বিশ্লেষণী নিবন্ধের প্রয়াস সেটাই নির্ধারণ করা।

ঐক্যবদ্ধ বাঙলাগঠনের প্রচেষ্টা বানচাল হয়েছিল কী ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাতে? তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য "অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়"এর শেষাংশে।

প্রবীণ গান্ধীবাদী লেখক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ-অভিজ্ঞতা কিভাবে আমাদের কিছু-কিছু বদ্ধমূল ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে তাই নিয়ে আলোচনা।

প্রয়াত খ্যাতিমান সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুজাফর শামসুদ্দীনের আত্মজীবনী পর্যালোচনা।

সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে রোগের উৎস সন্ধান না করেই ব্যবস্থাপত্র দেয়া নিয়ে সমালোচনা।

"মার্কসবাদ ও জীবন সংগ্রাম-তত্ত্ব" আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ডারউইনবাদের ত্রুটি নির্ধারণ এবং জীবনসংগ্রামের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন ড. অসিতকুমার রায়।

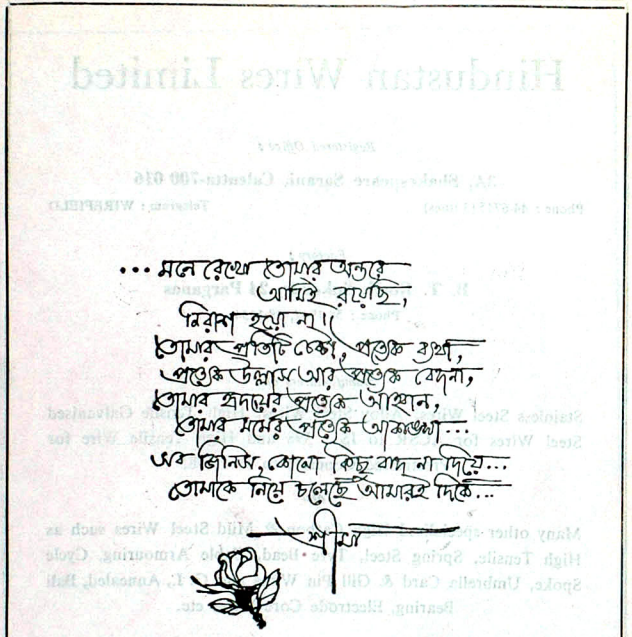

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ৬
অকটোবর ১৯৯০
আশ্বিন ১৩৯৭

বহুজাতিক সংস্থা ও ভারতবর্ষ ভবতোষ দত্ত ৪২৩
ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক পুলকনারায়ণ ধর ৪৩৭
অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায় : ১৯৩৭-৪৭ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫২

সংবাদ-সাহিত্য হরপ্রসাদ মিত্র ৪৩২
হয়নাম বিরাম মুখোপাধ্যায় ৪৩৩
ভূমিকাপালনে-দলনে প্রমাণিত নিখিলকুমার নন্দী ৪৩৪
জীবনযাপন সৈয়দ সমিদুল আলম ৪৩৬

মানুষের দাম নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৪৭২

গ্রন্থসমালোচনা ৪৮১
আজহারউদ্দীন খান, মেঘ মুখোপাধ্যায়, সুজিৎ ঘোষ

মতামত ৪৯৮
অসিতকুমার রায়

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশিত বই

Aniruddha Ray
—**The Rebel Nawab of Oudh : Revolt of Vizir Ali Khan 1799** Rs. 250·00

Sekhar Bandyopadhyay
—**Caste, Politics and the Raj : Bengal 1872—1937** Rs. 150.00

S. C. Biswas (*ed.*)
—**Gandhi : Theory and Practice, Social Impact and Contemporary Relevance**
(Sponsord by IIAS, Simla) Rs. 200.00

Mrinal Kumar Basu
—**Rift and Reunion : Contradictions in the Congress 1908—18** Rs. 125.00

Brajadulal Chattopadhyaya
—**Aspects of Rural Settlements and Rural Society in Early Medieval India**
(S. G. Deuskar Lecturers, 1985) Rs. 50.00

D. K Bhattacharya
—**Ecology and Social Formation in Ancient History** Rs. 55.00

Arun Ghosh
—**Agrarian Structure and Peasant Movements in Colonial and Post-Independence India**
(An Annotated Biblography) Rs. 150.00

Satya Brata Datta
—**Capital Accumulation and Workers' Struggle in Indian Industrialisation :**
The case of Tata Iron and Steel Company 1910—1970 Rs. 200.00

Bhaktibenode Chakraborty
—**Anton Chekov : The Crusader for a Better World** Rs. 70.00

গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ)
—**ইতিহাস অনুসন্ধান, ৫**
(পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ) Rs. 120.00

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ
—**পরিচয়-এর আড্ডা** Rs. 40.00

গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ)
—**ফরাসী বিপ্লব : দুশো বছরের আলোতে**
(পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ) Rs. 20.00

ইরফান হবিব (সম্পাঃ)
—**মধ্যকালীন ভারত (প্রথম খণ্ড)** Rs. 45.00

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য
—**ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ** Rs. 50.00

রণতোষ চক্রবর্তী (সম্পাঃ)
—**রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রাবলী** Rs. 15.00

রামশরণ শর্মা
—**প্রাচীন ভারতে শূদ্র** Rs. 70.00

হিতেশরঞ্জন সান্যাল
—**বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস** Rs. 75.00

জ্যাক লণ্ডন
আয়রন হীল (বাংলা অনুবাদ) Rs. 30.00

জর্জ অরওয়েল
অ্যানিমল্ ফার্ম (বাংলা অনুবাদ) Rs. 15.00

K P Bagchi & Company
286 B. B. Ganguli Street, Calcutta-700 012

বহুজাতিক সংস্থা ও ভারত

ভবতোষ দত্ত

এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাস দীর্ঘ। বাণিজ্য হত স্থলপথে এবং জলপথে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরবাসী এক গ্রীক নাবিক লিখেছিলেন "পেরিপ্লাস অভ্ দি এরিথ্রিয়ান সী"। এতে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যের এবং বাণিজ্যপথের বিস্তৃত বিবরণ ছিল। স্থলপথে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয় বণিক পণ্য বিক্রি করত, বিদেশী বণিকও ভারতে আসত। বহু শতাব্দী এভাবেই চলছিল। পরিবর্তন আনল ভাসকো-ডা-গামা-র আফ্রিকা ঘুরে ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার ১৪৯৮ সালে। প্রথমে পোর্তুগীজ এবং পরে অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের বণিক আর নাবিকেরা ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বাণিজ্যবিস্তারে আগ্রহী হয়ে উঠল। বহুজাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি হল তখন থেকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিপূর্ণ অর্থে "বহুজাতিক" না-ও হতে পারে। আজকাল "বহুজাতিক" প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা বুঝি এমন উদ্যোগ যার মালিকানা আর মূলধন শিল্পোন্নত দেশের, কিন্তু যার উৎপাদন ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন দেশে প্রসারিত। ইংরেজিতে "ট্রানসন্যাশন্যাল" ও "মালটিন্যাশন্যাল" কথা দুটি ব্যবহৃত হয়। আক্ষরিক অর্থে এক দেশের মূলধন আর মালিকানা সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে গেলেই বলতে পারা যায় যে প্রচেষ্টাটা ট্র্যানসন্যাশন্যাল বা সীমানা-অতিক্রান্ত। "বহুজাতিক" কথাটার প্রসার আরো বেশি। একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বহু দেশে বিস্তৃত, এবং এর মালিকানাতেও দুই বা ততোধিক দেশের অংশ থাকতে পারে। তবে এতটা সূক্ষ্ম বিভাজনে না গিয়ে আমরা এরকম সব প্রতিষ্ঠানকেই "বহুজাতিক" আখ্যা দিতে পারি।

ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানি

ভারতে প্রথম বহুজাতিক উদ্যোগের প্রবেশ ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানি নামে ১৬০২ সালে। প্রথম দিকে ইংল্যানডের রাজকীয় "চার্টার" পেয়ে এই কোমপানি ভারতে ও অন্য পূর্বাঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পায়। কিছুদিন পরে অন্য একটি কোমপানিও জন্ম নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটো এক হয়ে যায়। ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানির দেখাদেখি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল প্রায় একই সঙ্গে ওলন্দাজ ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানি এবং ১৬৬৪ সালে ফরাসি ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানি। ওলন্দাজদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের আশা ব্যাহত হয়,

কিন্তু বাণিজ্য চলতে থাকে—ভারতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে। ফরাসি কোমপানি ব্রিটিশ কোমপানির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল ১৭৬১ পর্যন্ত। ১৭৬৩ সালে ফরাসিরা চন্দননগর, পণ্ডিচেরি, মাহে এবং কারিকলে বাণিজ্যকেন্দ্র রেখে আর সব অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ব্রিটিশ ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানির আধিপত্য বেড়ে চলল সব দিকে। ১৭৭৫ খ্রী কোমপানি পূর্ব-ভারতে রাজস্ব আদায়ের ভার পেল, সঙ্গে-সঙ্গে এসে গেল বিচার এবং প্রশাসনের অধিকার। ১৮১৩ খ্রী কোমপানি ভারতের একটি বড়ো অংশের শাসক। তখন এর ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার লুপ্ত করা হল।

কথা উঠতে পারে—ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানির মতো সংস্থাকে কি আজকাল ব্যবহৃত অর্থে "বহুজাতিক" বলা যায়? আজকাল এজাতীয় উদ্যোগ নানা দেশে উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করে সুবিধামতো পণ্য উৎপাদন করে এবং সেই পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করে। ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানি প্রধানত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন নীলচাষ কোমপানির ব্যবস্থাতেই প্রসারিত হয়েছিল এবং কাঁচা নীল রপ্তানি-যোগ্য করার কাজটা কোমপানির হাতেই ছিল। কোমপানির কুঠিগুলির নাম ছিল "ফ্যাকটরি"। বিদেশী মূলধন দিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আসতে আরম্ভ করল ১৮১৩ সালের পরে। এদের বাণিজ্য বাড়ল দ্রুত হারে। ১৮২০-র দশকে স্টীমার এসে পালতোলা জাহাজের স্থান নিল। ১৮৫৩ খ্রী ভারতে চলল প্রথম রেলগাড়ি। ১৮৬৯ খ্রী খুলল সুয়েজ খাল। বিদেশী মূলধনে বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত বাণিজ্যের হল অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি।

বিদেশী মূলধন

সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশী মালিকের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানও আসতে আরম্ভ করল ব্যাপকভাবে। সরকার ডিভিডেনডের গ্যারানটি দিয়ে রেল কোমপানিদের আকর্ষণ করলেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলে স্থাপিত হল পাটের কল। কাজ আরম্ভ হল কয়লার খনিতে। বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে পাশি-গুজরাতি মূলধনের প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু পূর্ব ভারতের শিল্পপ্রসার প্রায় সবটাই হয়েছিল বিদেশী মূলধনে। এই মূলধন প্রধানত ব্রিটিশ, কিন্তু আমেরিকার টাকাও ছিল।

এভাবেই চলছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ শাসকেরা বুঝলেন যে ভারতীয় মূলধনে স্থাপিত ও পরিচালিত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। দুটি নতুন নীতি গৃহীত হল। প্রথম নীতিটি অনুসারে ভারতে যেসব শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, শ্রমিক ইত্যাদি আছে তাদের সংরক্ষণের জন্য আমদানি জিনিসের উপরে শুল্ক বসানো হল। দ্বিতীয় নীতিটি ছিল সরকারি সাহায্য-প্রদান সম্বন্ধে। বলা হল যে ভারত সরকার শুধু সেইসব শিল্পকেই সাহায্য করবেন যাদের মূলধন টাকার অঙ্কে ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত, যারা ভারতীয় ডিরেক্টর নিয়োগ করে এবং ভারতীয়দের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়। এই দুই নীতির ফলে ভারতীয় শিল্প-প্রসারে সুবিধা হল, কিন্তু বিদেশী উদ্যোক্তারাও নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য পরিবর্তিত পদক্ষেপণ করল।

কোনো-কোনো বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নতুন নাম দিয়ে ভারতে কারখানা আর কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করল—যাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ভারতীয় কোম্পানি। সুইডেনের দেশলাই তখন সব দেশের বাজার অধিকার করে থাকত। এই দেশলাই-নির্মাতারা ভারতে নতুন কোম্পানি স্থাপন করল—ওয়েস্টার্ন ইনডিয়া ম্যাচ কোম্পানি, বা সংক্ষেপে উইমকো। অন্য অনেক বিদেশী সংস্থা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করল অধীন বা 'সাবসিডিয়ারি' কোম্পানি—আগের নামের সঙ্গে ব্রাকেটে "ইনডিয়া" শব্দটি জুড়ে দিয়ে।

"ক.খ.গ. কোম্পানি লিমিটেড" নামের বিলাতি কোম্পানির আশ্রিত ভারতীয় কোম্পানির নাম হল "ক.খ.গ. (ইনডিয়া) লিমিটেড"। কিছু ভারতীয় শেয়ার-হোলডার এবং ভারতীয় ডিরেক্টর থাকল কিন্তু মূল কর্তৃত্ব থেকে গেল বিদেশী মালিকদের হাতেই।

এই অবস্থাটাই চলছিল স্বাধীনতা-পূর্ব কাল পর্যন্ত। শুধু যেসব শিল্পে লাভের সম্ভাবনা কমে আসছিল, তাদের কিছু-কিছু ভারতীয় শিল্পপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল। এর প্রধান উদাহরণ পাটের কল। অন্যদিকে, নানা রকম বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার আবির্ভাব হচ্ছিল। বিদেশী ব্যাঙ্ক আসছিল উনিশ শতক থেকেই—এদের মধ্যে কোনো-কোনোটি (যেমন হংকং ব্যাঙ্ক বা চার্টার্ড ব্যাঙ্ক) কাজ করত সমগ্র পূর্ব এশিয়াতে। বিলাতি জীবনবীমা কোম্পানি ভারতে ব্যাবসা করছিল অবাধে। কানাডা থেকে সেখানকার বিখ্যাত বীমা কোম্পানিও ভারতে তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করছিল। বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে একটা সবল মত কুড়ির দশক থেকেই জেগে উঠছিল, কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে দেশের আর্থিক নীতিতে বিদেশী মূলধনের স্থান স্বীকার করে নেওয়া হল। এর পরেই হল ক্রমে-ক্রমে বহুদেশব্যাপী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ভারতে নব-পর্যায়ের আগমন।

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে অনেকেই বলেছিলেন যে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য যে মূলধন আর প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে সেটা দেশের ভিতর থেকে পাওয়া যাবে না। অতএব উন্নতির স্বার্থে বিদেশী মূলধনকে আসতে দেওয়া হবে। আশা ছিল যে, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের ফলে রপ্তানি বাড়বে এবং সেই রপ্তানির অর্জন থেকেই বিদেশী মূলধনের প্রাপ্য লভ্যাংশ ও সুদ দেওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ভারতীয় শিল্পপতিরা "সাবালক" হয়ে উঠেছেন। বিদেশী মূলধনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন ধরনের উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করবার জন্য আগ্রহী হয়েছেন। সরকারি কর্মনীতিকেও প্রভাবিত করছেন। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সমর্থন পেল ভারতীয় শিল্প-পতিদের কাছ থেকে এবং উচ্চতম স্তরের সরকারি নীতি-নির্ধারকদের কাছ থেকে। যন্ত্রপাতি, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে সাদরে গ্রহণ করা হল। ষাটের দশকে নেওয়া হল "আমদানির বিকল্প" উৎপাদনের নীতি। কোন্‌টা প্রয়োজনীয়, কোন্‌টা দরিদ্র দেশের পক্ষে বাহুল্য, সেসব না চিন্তা করেই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে আসতে দেওয়া হল সর্বক্ষেত্রে—যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক পণ্য, ওষুধ, মোটরগাড়ি, ঘড়ি থেকে আরম্ভ করে সিগারেট, বিস্কিট, "নরম" পানীয়, চকোলেট, দাঁতের মাজন পর্যন্ত। যখন সরকার এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সজাগ হলেন তখন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান আর ভারতীয় সহযোগীদের সম্মিলিত ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে এবং গভীরভাবে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

ভারতে এখন শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে নিযুক্ত বিদেশী বেসরকারি মূলধনের পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অংশ ব্রিটেনের এবং দ্বিতীয় স্থানে আছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্যদের মধ্যে জার্মানি, হল্যানড এবং জাপান উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এখানে মনে রাখা উচিত যে উপরের তলায় মালিকানার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যে কোম্পানিকে আমরা ব্রিটিশ বলে ধরে নিয়েছি, সেটা হয়তো আমেরিকার হাতে চলে গিয়েছে। ভারতের হিন্দুস্তান লিভারের মালিক বহু-জাতিক ইউনি-লিভারের উপরে আছে ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও আমেরিকান মালিকানা। বিলাতি কোম্পানি "হান্‌টলি পামার" ভারতে স্থাপন করে-ছিল "ব্রিটানিয়া বিস্কিট কোম্পানি"। ব্রিটানিয়া এখনো আছে (নামটা সংক্ষিপ্ত করে)। কিন্তু হান্‌টলি

পামারের মালিকানা চলে গিয়েছিল আমেরিকার ন্যাশন্যাল বিস্কিট কোম্পানির হাতে, এবং পরে সেই আমেরিকান কোম্পানিতে হাত বাড়িয়েছে একটি ফরাসি প্রতিষ্ঠান। বিলাতি "লয়েডস্ ব্যাঙ্ক"-এর অনেক শাখা ছিল ভারতে। সেগুলি যুক্ত হয়ে গেল "গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক" এবং "ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক"-এর সঙ্গে (দুটিই বিলাতি ব্যাঙ্ক)। নতুন নাম হল "ন্যাশন্যাল অ্যানড গ্রিন্ডলেজ"। কয়েক বছর পরে আবার নাম বদল হল—শুধু "গ্রিন্ডলেজ"। মালিকানার অনেকটাই ছিল বিলাতের লয়েডদের হাতে, কিন্তু সেটা বিক্রি হয়ে গেল আমেরিকার ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অভ নিউ ইয়র্কের কাছে। আমেরিকান মালিকানা আবার এখন বিক্রি হয়েছে অস্ট্রেলিয়া অ্যানড নিউজীল্যান্ড ব্যাঙ্কের কাছে। সাদা চোখে বুঝবার উপায় নেই "হিন্দুস্তান লিভার" বা "আই. টি. সি."-র মালিক কারা, কারা সত্যি-সত্যি চালায় "বাটা" বা "ফিলিপস" ("পেইকো") বা "নোসিল"। আমেরিকার কোন্ কোম্পানির কতটা শেয়ার জাপান বা আরব দেশে চলে গিয়েছে, তার সম্পূর্ণ চিত্র আমরা পাই না।

বহুজাতিক উদ্যোগের প্রকারভেদ

বহুজাতিক মূলধন আর মালিকানা ভারতে (এবং অন্য অনেক দেশে) কিভাবে কাজ করে, সেটা একটু বিস্তারিতভাবে দেখা উচিত। আগেকার দিনে বিদেশী কোম্পানি আমাদের মতো দেশে নিজেদের অফিস বা শাখা-অফিস খুলত এবং তার তত্ত্বাবধানে কারখানাও প্রতিষ্ঠিত করত। কখনো-কখনো ভারতে কর্মরত বিলাতি "ম্যানেজিং এজেন্ট"দের হাতে শাখা-কোম্পানি আর কারখানার পরিচালনার ভার দেওয়া হত। আজকাল প্রত্যক্ষ শাখা-অফিস অনেক ক্ষেত্রেই নেই। আছে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে। ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ছাড়াও এখন ভারতে কাজ করে আমেরিকান, ফরাসি, ওলন্দাজ, জাপানি ও মধ্য-এশিয়ার ব্যাঙ্কের শাখা। এগুলি অবশ্য আমাদের দেশের আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়।

বর্তমান কালে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানি শাখা-অফিস না খুলে, 'আশ্রিত' বা 'সাবসিডিয়ারি' কোম্পানি খোলে—একটু পরিবর্তিত নামে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় শিল্পপতিরাও এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আইনের চোখে এদের ভারতীয় কোম্পানি বলেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। আমাদের বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ("ফেরা") অনুসারে সাধারণভাবে এসব কোম্পানিতে বিদেশী মূলধনের অনুপাত ৪০ শতাংশের বেশি হতে পারে না, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন রপ্তানিযোগ্য জিনিসের উৎপাদনের বেলাতে—এই অনুপাত ৫০ বা এমন-কী ৭৫ শতাংশেও যেতে দেওয়া হয়। এগুলি সরকারি বর্গীকরণে "যৌথ প্রতিষ্ঠান" বলে দেখানো হয়। এদের সংখ্যা বাড়ছে এবং বহু মৌল পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের প্রভাব দূরব্যাপী।

এই ধরনের উদ্যোগের কাছাকাছি আসে সেইসব প্রতিষ্ঠান যারা বিদেশী সংস্থার সঙ্গে "সহযোগ" বা "কোল্যাবরেশন"-এর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ভারতে গাড়ি তৈরি করতে হবে, জাপানি কোম্পানির প্রযুক্তি ও উপাদান ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়। ঘড়ি তৈরি করতে হবে, সেখানেও জাপানি প্রযুক্তি। বহু ভোগ্য-দ্রব্যের বেলাতেও বিদেশী প্রযুক্তির জন্য চুক্তি করা হয়। এমনকী সোডা-ওয়াটারের জন্যও আমাদের চুক্তি আছে ইতালির কোম্পানির সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রে সহযোগ অত্যন্ত গভীর। যে জিনিসটা ভারতে তৈরি হবে তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি আসে বিদেশী সহযোগীর কাছ থেকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় পুরোপুরি। চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎপন্ন জিনিসের স্ক্রু-বলটু খুলে নিয়ে 'সি-কে-ডি' (কমপ্লিটলি নকড্ ডাউন) অবস্থায় আমদানি করা হয়, তাতে শুল্ক কম লাগে। ভারতীয় কারখানাতে সব আবার জুড়ে দেওয়া হয়। একেই অনেক সময় বলা হয় "স্ক্রু-ড্রাইভার প্রযুক্তি"। একটি বিখ্যাত "ভারতীয়" টেলিভিশন-নির্মাতা একবার বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—আমাদের নামটাই শুধু ভারতীয়, আর সব বিদেশ থেকে আনা। ক্রেতার অভাব হয় নি।

"প্রতিশ্রুতি" ও শর্ত

সরকার কখনো-কখনো একটা প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেন যে ক্রমে-ক্রমে উৎপাদনের উপাদানের ভারতীয়করণ হবে। কাগজে-কলমে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়। দেখানো হয় যে, বিদেশী-সহযোগে পরিচালিত কারখানাতে ক্রমেই বেশি করে "ভারতীয়" জিনিস ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা ভারতীয় অন্য কোম্পানির কাছ থেকে উপাদান কেনে ঠিকই, কিন্তু সেই বিক্রেতা কোম্পানি কতটা আমদানি-নির্ভর সে তথ্য প্রকাশ পায় না। একটা জিনিস সহজেই চোখে পড়ে। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় শিল্পোৎপাদনে আমদানি-নির্ভরতা বাড়ছে।

বহুজাতিক সংস্থার আশ্রিত ভারতীয় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অন্য একটি প্রতিশ্রুতিও অনেক ক্ষেত্রে নেওয়া হয়। সেটা হল এই যে, এই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদনের একশ শতাংশই রপ্তানি করবে। যদি এই প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন করা হয় তাহলে ভারতের নানা দিক থেকে উপকার হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালিত হয় না—একটি বিশেষ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র ছাড়া। যদি ভারতে স্থাপিত কারখানাটি যেসব জিনিস উৎপাদন করে তার সবটাই সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক কোম্পানি তাদেরই অন্যদেশ-স্থিত কারখানার জন্য কিনে নেয় (সঠিক দামে) তাহলে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে এটা সহজেই হতে পারে যে বিদেশের বাজারে ওই বিশেষ "ভারতীয়" পণ্য বিক্রি হচ্ছে না—দাম বেশি, চাহিদা কম, অন্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি নানা কারণে। তখন সরকারকে বাধ্য হয়ে শর্ত শিথিল করতে হয়। আজ-কাল এটা একরকম গৃহীতই হয়ে গিয়েছে যে উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ রপ্তানি করলেই প্রতিষ্ঠানকে ১০০ শতাংশ "রপ্তানি-মুখী" বলে মেনে নেওয়া হবে। ভারতে অবস্থিত বহুজাতিক সংস্থা ভারতের বাজারে বিক্রি করতে পারলে আনন্দিত হয়, কারণ এখানে দাম বেশি, লাভ বেশি।

অন্য এক ধরনের ব্যবস্থাও আছে। ভারতীয় শিল্পপতি এবং বহুজাতিক সংস্থার মধ্যে চুক্তি হতে পারে যে বিদেশী প্রযুক্তি (বা "ফরমুলা") ব্যবহার করতে পারা যাবে "রয়্যালটি"র বিনিময়ে। কখনো-কখনো যন্ত্রপাতিও পাওয়া যায় বার্ষিক ভাড়া-র ব্যবস্থায়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে শুভ-ফলদায়ক হতে পারে। কিন্তু যে প্রযুক্তি বা যন্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয় সেটা হয়তো বিদেশে বাতিল হয়ে গিয়েছে। আমরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের প্রযুক্তি ও যন্ত্রের জন্য অনেক টাকা রয়্যালটি বা ভাড়া দিই। বলা যেতে পারে যে, বহু জিনিস (যেমন সাবান, টুথপেস্ট) আছে যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি না হলেও চলবে। কিন্তু, এর উত্তরে বলা যায় যে, এ ধরনের জিনিসের জন্য আমরা বিদেশী প্রযুক্তির উপরে নির্ভর করব কেন? আমাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে যতটা হয় তাই হতে দেওয়া হোক।

এই প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ওঠে। ষাটের দশক থেকে একটা "নীতি"-র কথা শোনা যায়—"আমদানির বিকল্প তৈরি করো।" উদ্দেশ্য, আমদানি কমানো। কিন্তু এর ফল হল যদৃচ্ছভাবে নতুন কারখানা স্থাপন এবং আমদানির বিকল্প উৎপাদন। বিলাসদ্রব্য, বিশেষ করে ধনিজন ব্যবহৃত ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়ল বহুল পরিমাণে—কখনো সরাসরি বিদেশী ট্রেড মার্ক নিয়ে, কখনো বা নামটা একটু পরিবর্তন করে। আমাদের বাজারে বহুবিক্রীত এমন অনেক জিনিস আছে যার বেশির ভাগই উৎপন্ন হয় বহুজাতিক কোম্পানির স্বনামে বা বেনামে পরিচালিত

শাখা বা আশ্রিত কোম্পানিতে। আমাদের দেশের উদ্যোক্তারা এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠে না। ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সংখ্যায় কম।

বহুজাতিকেরা কেন আসে?

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি কিসের আকর্ষণে ভারতের মতো দেশে তাদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত করতে চায়? লাভের সন্ধানে ভারতীয় শিল্পপতিরা বিদেশী সহযোগ খুঁজবে—এটা বোঝা যায়। কিন্তু বহুজাতিক সংস্থাগুলি কেন আসে? এ প্রশ্নের উত্তর একটামাত্র নয়; যদিও শেষ পর্যন্ত এসব সংস্থারও মোট লাভের পরিমাণ বাড়াবার জন্যই আগ্রহ থাকে। কিন্তু অধিকারের সম্প্রসারণ, আর্থিক সাম্রাজ্যের বিস্তার ইত্যাদি উদ্দেশ্যও থাকে—এবং এর পিছনে থাকে বিদেশী সরকারের সক্রিয় অনুমোদন আর সাহায্য। আকর্ষণের কারণগুলির মধ্যে সবচেয়ে সহজে চোখে পড়ে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতে শ্রমিক-মজুরির নীচু হার। উৎপাদনশক্তির তারতম্য অবশ্য আছে, কিন্তু মজুরির হার কম হওয়াতে সেটা পুষিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ভারতের মতো দেশে সরকারি বিনিয়োগে রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ঘাটতি অনেক আছে, কিন্তু সরকারি বিনিয়োগও বাড়ছে। বিদেশী সংস্থা দেখতে পায় যে, পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য ব্যয়ভার বহন করছে সরকার।

তৃতীয়ত, সাধারণভাবে বিদেশী সংস্থা তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ, সুদ বা রয়্যালটি নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পারে। বিদেশে টাকা পাঠানো সম্বন্ধে আমাদের অনেক কড়াকড়ি আছে, কিন্তু বিদেশী সংস্থার ভারতে অর্জিত লাভ, তাদের রয়্যালটি বা অন্য পাওনা এবং প্রয়োজনমতো আমদানির জন্য দেয় বিদেশী মুদ্রার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ খুবই শিথিল। এই ব্যবস্থার অপব্যবহার হতে পারে নানাভাবে। বহুজাতিক সংস্থার পক্ষে ভারতে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে এই ধরনের অপব্যবহারের সুযোগ যে একেবারে নেওয়া হয় না—সে কথা জোর দিয়ে বলা হয় না। ভারতীয় আমদানি-কারক ক্রীত জিনিসের দাম বেশি দেখিয়ে বাইরে টাকা পাচার করে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানও তাদের "ট্রানসফার প্রাইস"-এর কারচুপিতে অনভ্যস্ত নয়।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ভারতে অনুপ্রবেশের চতুর্থ (এবং খুব বড়ো) আকর্ষণ ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার। রপ্তানির শর্ত থাকলেও ভারতের বাজারে বিক্রি করবার লোভ সংবরণ করা কঠিন, কারণ এই বিক্রিতে লাভ বেশি, হাঙ্গামা কম। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার খুবই বিরাট, এমনকী ধনিজন-ব্যবহার্য জিনিসের বেলাতেও। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৮১ কোটি বা ৮১০ মিলিয়ন। এর মধ্যে আয়স্তরের উচ্চতম দশমাংশ আমাদের মোট গার্হস্থ্য আয়ের প্রায় ৩০ শতাংশের অধিকারী। ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশ পাশ্চাত্য অঞ্চলের অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। একটু তুলনা করে দেখা যাক। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৮৭-র মধ্য ভাগে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৭৯৮ মিলিয়ন (৮০ কোটি)। এর এক-দশমাংশ ৮০ মিলিয়ন বা ৮ কোটি। ওই সময়ে মোট জনসংখ্যা ছিল পশ্চিম জার্মানিতে ৬১ মিলিয়ন, ইতালিতে আর ব্রিটেনে ৫৭ মিলিয়ন করে, ফ্রান্সে ৫৬ মিলিয়ন, হল্যান্ডে ১৫ মিলিয়ন, বেলজিয়ামে ১০ মিলিয়ন, আর সুইটজারল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে আর ডেনমার্কের কোনোটিতেই ৮ মিলিয়নের বেশি নয়। অর্থাৎ এই-সব দেশের 'সামগ্রিক' বাজারের চেয়ে ভারতের বাজারের এক-দশমাংশে সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা বেশি। এই উচ্চতম দশমাংশই থেকে গাড়ি, স্কুটার, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, কৃত্রিম তন্তুজ জামা-

কাপড়, দামি প্রসাধনদ্রব্য, টিনের খাদ্য, ভাইটামিন টনিক। উচ্চতম দশমাংশের পরে যদি আরো এক-দশমাংশ নিই, তাহলে দেখি যে এদেরও মোট ক্রয়ক্ষমতা কম নয়। বিজ্ঞাপনের মোহে আকৃষ্ট হয়ে এরা ভোগবাদী হয়ে পড়ে; ভারতীয় এবং বহুজাতিক সংস্থায় সম্মিলিত আক্রমণের শিকার হয়।

সুফল-কুফল

এবারে আমাদের শেষ প্রশ্নে আসতে পারি। বহুজাতিক সংস্থায় ভারতে উৎপন্ন ও বাণিজ্যপ্রচেষ্টার বিস্তারে আমাদের সবসুদ্ধ লাভ-ক্ষতি কতটা? এ প্রশ্নের উত্তরে একটা মোট যোগফল পাওয়া যাবে না, কিন্তু অনেক দিক থেকে আংশিক উত্তর দেওয়া যাবে। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, এককালে যেমন বিদেশী মূলধনে আমাদের রেলপথের বিস্তার হয়েছিল, পাটের কল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি বর্তমান যুগেও বিদেশী সহযোগের ফলে আমাদের শিল্পে উন্নতি হয়েছে নানা দিকে। ব্রিটেনের মরিস, ইতালির ফিয়াট, জার্মানির মার্সিডেস্-বেনৎস, জাপানের সুজুকি ইত্যাদির প্রযুক্তির ও উপাদানের সাহায্য না পেলে আমাদের মোটর-যান-শিল্প গড়ে উঠত না। জাপানি প্রযুক্তিতে ঘড়ি তৈরি হয়েছে, ব্রিটিশ-আমেরিকান-জার্মান প্রযুক্তিতে উৎপন্ন হয়েছে রাসায়নিক দ্রব্য। কিন্তু এর থেকে ছুটো প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, যত সব ক্ষেত্রে আমরা বিদেশী প্রযুক্তি নিয়েছি, তার সবেতেই কি আমাদের উচ্চতম মানের প্রযুক্তি প্রয়োজন ছিল? উচ্চতম মানের যন্ত্রপাতি আমরা চেয়েও পাই নি, একথাও ওঠে। দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে—ধরা যাক ১৯৬১-৬৫—যদি বিদেশী প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে আজ পর্যন্তও সে প্রয়োজন থাকবে কেন? বিদেশী প্রযুক্তি, কারিগরি সাহায্য সহজেই পাচ্ছি বলেই কি আমরা নিজেদের প্রযুক্তির উন্নতির দিকে নজর দিচ্ছি না? এখানে বলা উচিত যে, বিদেশী সংস্থার বিদেশী কারখানা ও পরীক্ষাগারে যাঁরা নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে অনেক ভারতীয় আছেন।

বহুজাতিক সংস্থার উদ্যোগ থেকে আমরা ঠিক কতটা কী পেয়েছি তার সর্বাঙ্গীণ পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। রপ্তানি বেড়েছে, কিন্তু সে-রপ্তানির কতটা বহুজাতিক সংস্থা থেকে আসছে, সেটা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। কয়েকটা বড়ো কোম্পানির হিসাব পাওয়া যায়, কিন্তু মোট চিত্রটা সুস্পষ্ট নয়। বিদেশী মুদ্রা অর্জন ও ব্যয়ের বেলাতেও হিসাবটা জটিল হয়ে পড়ে। বিরাট পরিমাণে ব্যয় হয় রয়্যালটি, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বেতন, উপাদান আমদানি ইত্যাদির জন্য। বিদেশী মুদ্রাতে ব্যয় ২০০ কোটি টাকা, আর বিদেশী মুদ্রার উপার্জন ২০ কোটি টাকাও নয়, এমন কোম্পানিরও খবর পাওয়া যায়। আসলে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ আমাদের দেশে যতটা মনে হয় ততটা নয়—অল্প মূলধন নিয়ে পক্ষপুটে আশ্রিত ভারতীয় শিল্পপতিদের সহায়তায় বহুজাতিক সংস্থা নিজেদের উদ্দেশ্য সহজেই সাধন করতে পারে। লভ্যাংশের টাকার চেয়ে অন্য দিকের লাভই বেশি আকর্ষণীয়।

বিদেশী সহযোগে পরিচালিত সংস্থায় কাজের ফলে কি আমাদের দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে? প্রথমেই চোখে পড়ে যে এইসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন মূলত যন্ত্রভিত্তিক, এতে তুলনামূলকভাবে শ্রমিক-নিয়োগ কম। তা ছাড়া, এখন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের তত্ত্বাবধানে (অনেক সময়ে বেনামিতে) ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে এবং এদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নিচ্ছে। ক্ষুদ্রশিল্প ও বৃহৎশিল্পের অঙ্গাঙ্গী সহাবস্থান অনেক দেশেই আছে, কিন্তু আমাদের দেশে বড়ো শিল্পগোষ্ঠীই ছোটো-ছোটো কারখানা স্থাপন করছে। উদ্দেশ্য অনেক—ছোটো

কারখানাতে শ্রমবিরোধ কম, মজুরি কম, আর নানা ধরনের সরকারি সাহায্য প্রচুর। এর একটা ফল হচ্ছে সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের সঙ্কোচন। ছোটো কারখানা মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তাদের হাতে থাকলে যতটা কর্মী-নিয়োগ হত, বড়ো মালিকের হাতে পড়লে ততটা হয় না—কারণ তখন উঁচুদরের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা হয়। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত ক্ষুদ্রশিল্পের বিস্তারে শ্রমিক-নিয়োগ কমতে পারে—একথা সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

"ট্র্যান্সফার প্রাইস"

'ট্র্যান্সফার প্রাইস' বা আভ্যন্তরীণ মূল্যের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর লীলাখেলা বহু-বিস্তৃত। একটি বহুজাতিক সংস্থার যদি বিভিন্ন দেশে উৎপাদন-উদ্যোগ থাকে এবং সেই উৎপাদন এক দেশ থেকে উপাদান হিসাবে এনে অন্য দেশের কারখানাতে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে এই আমদানি-করা উপাদানের একটা দাম ধরতে হয়। সে দামটা, একান্তই আভ্যন্তরীণ—একই সংস্থার একটি কারখানা এই দাম দেয় তাদেরই অন্য একটি কারখানাকে। মালয়েশিয়াতে রবার উৎপন্ন করে ভারতের কারখানায় টায়ার তৈরি করা হয়, এবং সেই টায়ার তৃতীয় একটি দেশে বিক্রি করা হয়। হিসাবে যে দাম দেখানো হয়, সেটাকে কমানো-বাড়ানো হয় মূল মালিকদের স্বার্থ অনুসারে। এটা বিশেষ করে নির্ভর করে দেশগুলির আমদানি-রপ্তানির নিয়মাবলী এবং শুল্কের হারের উপরে। যেখানে শুল্ক বেশি, সেখানে দামটা কম করে দেখানো হয়; যেখানে শুল্ক কম, সেখানে দামটা বেশি রাখলেও ক্ষতি নেই। এই ট্র্যান্সফার প্রাইসের ওপরে আমাদের সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু আমাদের আমদানি-রপ্তানি শুল্কের আদায়ে কম পড়ে যায়, আমদানি-ব্যয়ও বেড়ে যেতে পারে।

এ ছাড়াও আছে মধ্যবর্তী বিক্রেতারা, যারা বহুজাতিক সংস্থারই আত্মজ। একটি বহুজাতিক কোম্পানি হয়তো ভারত থেকে অন্য কোনো একটি দেশে রপ্তানি করবে যা থেকে ৫০০ কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোম্পানিটি বিদেশে একটি ক্রয়-বিক্রয়সংস্থা স্থাপন করে তার কাছে ৫০০ কোটি টাকার জিনিস বিক্রি করবে ৩০০ কোটি টাকাতে। আমাদের রপ্তানি বাড়বে ৩০০ কোটি টাকা, বিদেশী ক্রেতা দেবে ৫০০ কোটি টাকা—মাঝখানের ২০০ কোটি টাকা বহুজাতিক সংস্থার লাভ।

বহুজাতিক সংস্থার পক্ষেই সম্ভব বিজ্ঞাপনের জোরে বোঝানো যে তাদের উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্যের কোনো বিকল্প নেই। ইয়োরোপের একটি দেশে দুধের সরবরাহ অঢেল, কিন্তু একটি বহুজাতিক সংস্থা প্রচার চালাল যে সরাসরি দুধ পান করার চেয়ে অনেক ভালো টিন-বন্দী গুঁড়ো দুধ থেকে তৈরি পানীয় ব্যবহার। এমনকী এই গুঁড়ো দুধের পানীয় শিশুদের বেলাতে মাতৃদুগ্ধের চেয়েও ভালো—একথাও বলা হয়েছিল। আমাদের মতো দেশে ভোগবাদের প্রসারে বহুজাতিক সংস্থার "অবদান" গভীর স্তরে চলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে আছে রাজনৈতিক প্রভাব। সংস্থার নিজেদের দেশের সরকার দরিদ্র দেশে চাপ সৃষ্টি করে নানা-ভাবে এবং তথাকথিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়। দেশগুলির ভিতরেও বহুজাতিক সংস্থার পক্ষে প্রবক্তার অভাব হয় না। সহযোগী শিল্পোদ্যোগী, রাজনৈতিক নেতা, স্বার্থান্বেষী রাজপুরুষ—এই ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী।

বহুজাতিক সংস্থা বা বিদেশী মূলধনের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ করার কথা ওঠে না। আগেই বলা হয়েছে যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছি। অন্যদিকে, নানা রকমের "নীতি" পরিবর্তনে, নানা ধরনের শক্তির প্রভাবে আমরা এমন অনেক ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাকে আসতে দিয়েছি, যেখানে অগ্রাধিকারের যুক্তি খাটে না, যেখানে উৎপন্ন

জিনিসগুলি না হলেও আমাদের চলত, যেখানে অনেক বিলাসদ্রব্য একটু নিয়মানের হলেও ক্ষতি হত না, যেখানে রপ্তানির নাম করে অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোগস্পৃহা বাড়ানোর পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। অর্থাৎ বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশ, সহযোগী ব্যবস্থা, কাজকর্ম, নব-সৃষ্ট কর্ম-সুযোগ, আন্তর্জাতিক লেন-দেনে নীট উপার্জন ইত্যাদি সব বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রয়োজন। এ প্রয়োজন আগেও ছিল, এখন এ প্রয়োজন আরো বাড়ছে। বিদেশী মূলধন এবং বিদেশী প্রযুক্তির পক্ষে প্রবক্তারা উচ্চগ্রামে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। পূর্ব ইয়োরোপের ঘটনাবলীতে তাঁরা আপাত-মনোহর যুক্তি পাচ্ছেন, কিন্তু এটাই মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব সমস্যা নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে সমাধান করতে হয়, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়নের সহায়তায়।

সংবাদ-সাহিত্য

হরপ্রসাদ মিত্র

গাধাদের নেই ট্রামে-বাসে চড়া অভ্যেস,
ঘুঘুদের নেই ঘুঁটে-কয়লার চাহিদা।
শালিকেরা বিনা-কেরোসিনে আছে দিব্যি,
ঠিকেগাড়িটানা ঘোড়ারা কি পায় পেন্‌শন?

ওরা বেশ আছে প্রকৃতির কোলে শান্ত,
রাজনৈতিক উৎপাত থেকে মুক্ত।
মানুষ কেন-যে প্রাণধারণের জন্যে
চায় ডাল-ভাত, কখনো নিমের সুক্ত?

ন্যূনতম এই পাকপ্রণালীর স্বার্থে
রান্নার গ্যাস না পেয়ে হচ্ছে ব্যর্থ?
আসল কথাটা বোঝেই না—পরমার্থ।
এ-রোগের নেই ওষুধ এবং পথ্য।

পেটে খেলে পিঠে সইত যে-কালে,—নেই তা।
এখন জমানা বদলেই গেছে, অতএব
লোডশেডিঙের দাপটে ঘামতে-ঘামতে
সব প্রভুকেই ভালো-লোকে দিক টেক্‌শো।

হয়নাম

বিরাম মুখোপাধ্যায়

ঘোড়া-ধরা-মাঠের ঠিকানা থ্যাত্‌লানো উনোজমি—
ঝাড়গ্রাম ঝামরান আঁকাবাঁকা টাঁড়ের কাছেই
খটখটে দুধপুর্ণিমায় কিংবা দু'দণ্ড আগেই
তারা আসে যুথবদ্ধে বাঁকাঘাড়ে লাগামবিহীন—

সপাসপ চাবুকের শিসে আছড়ানো শব্দবায়ু
বাগে পেলে জিভের ফেনার আঠা মোকাবিলা দাঁতে
চিবোবে ভয়ের বিহ্বলতা—ঘাড় নোয়াবে না তবু
বুনো-প্রজন্মের বেতো ঘোড়া টাট্টু টাট্টুনির নাতি-

পুতি এক-গোঁ এখন। পাঁচ কিলো ছোলা-ভুষি-দানা
বাঁ-পায়ের চাটে ছুঁড়ে ছায় ক্ষিপ্র ধারালো হিম্মত—
ঘোড়া-ধরা বেদেদের তেলঘাম কৃপণ পূর্ণিমা
ষোলোকলা পূর্ণ হবে কি হবে না আঠারো ঝঞ্ঝাটে

শলা-পরামর্শ ফাঁদ-ফিকিরের ভিন্ন উদ্ভাবনা
ঘোড়া-ধরা-মাঠের কিনারে আকাশ পেতেছে আড়ি
মৃত্যুহীন মাদক-বুলেটে বশ্যতার কী কৌশল!
ঝাড়গ্রাম ঝামরান টাঁড়ে সারিবন্দী ভাঙাহাঁটু

লাগাম ছেঁড়ার আর রণোন্মাদ খুরের ক্ষিপ্রতা
স্বপ্নে টগবগ মৃত্যুফাঁদ ছিঁড়ে অ-বশ্য নিষ্কৃতি
জানে বাহিনীর বীর-বাহাদুর তিন টোটে জয়ী
আস্তাবলমুখী হাঁটে গর্বস্ফীত দু'বিঘত ঘাড়॥

ভূমিকাপালনে-দলনে প্রমাণিত

নিখিলকুমার নন্দী

ভূমিকাপালন বটে! কী দারুণ নিদারুণ আবধ্য আবদ্ধ ভূমিকায়!

প্রম্পটার ডুব দিয়েছে, নাট্যকারও নেপথ্যে নিলীন।
সামনে বিচিত্র ভীড় প্রত্যাশা-প্রার্থীর সমাবেশ; গ্রাহ্য কিছু বস্তুর আদায়ে;
'ইচ্ছাপূরণ' যেন হয়! নইলে ছুয়ো-টিটকারি-ঠাট্টায় ক্রুর ধিক্কারের সর্পাঘাত অনিবার্য।
অনাদায়ে প্রিয়রাই সবচেয়ে বড় উৎপীড়ক।

এরই জন্য কাষ্ঠমঞ্চে একটানা হাতপানাড়া লাফঝাঁপ 'অ্যাকশন'-ফেনিল
বুক থেকে মুখ থেকে রক্ততোলা চূড়ান্ত চিৎকার: 'শেষ অব্দি যেতে হবে'।

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে" এত মনোরঞ্জনের দাবি, এত মনমাতনের দায়!

কণ্ঠনালী শুষ্ক হয়; পেটে ঘিনঘিনে ব্যথা তীক্ষ্ণতর বেঁধে;
হাঁপধরা বুকে চাপ; হাঁটুমাজা ভাঙে, ভেঙে পড়ে···

'ওঠো ওঠো, উঠে পড়ো'—প্রাণপণ ওঠার চেষ্টায় একেবারে প'ড়ে যাওয়া···
অকালজড়ত্ব—অথর্বতা! সারা দেহে জবজবে ঘাম—ধূলিশয্যা পতনে-মূর্ছায় শুধু শেষ শূন্যের আশ্রয়!

["জ্ঞানের বিহনে (এই) প্রেম নেই" সত্ত-সার দুনিয়াদারিতে
স্থূল লাভ-অর্থীদের অলিখিত দায়বদ্ধ বশ্যতার দাসখত ঘিরে ঘিরে ঘুরে
সুযোগসন্ধানী সূত্রধার এবার অদৃশ্য থেকেই তাই থামামাত্র হেঁকে ওঠে: 'ঠিকই আছে, এক্কোর! এক্কোর!'
(এখানে বন্ধনীমধ্যে কাকতালীয় পতন ও মূর্ছা ছিল ঠিকই)···পাঠ আছে, আরও পাঠ—শুয়ে-শুয়েই
বলে-যাওয়া ক'রে-যাওয়া প্লে—'

কিন্তু পাঠ? কার পাঠ? কে কাহার পার্ট করে?
নিঃস্ব ও নিঃশেষ যে ইতিমধ্যে ভূমিশয্যাশায়ী, তাহারও ভূমিকা!
(তার আবার প্লে! পড়তে-পড়তে মরতে-মরতে তথাপি ডিস্‌প্লে!)

হ্যাঁ, তাইতো! পার্ট ছিল, পাঠ ছিল আরও; ব'লে-যাওয়া ক'রে যাওয়া ছিল
যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ··· হতাশ! হতাশ!

আঁশশুদ্ধ সারভাগ খেয়ে গেছে কুরে কুরে নরনারী মুখোসের বানর-বানরী কিছু—
এখন তো আঁটি! এই তো আত্মীয়সভা-সময়-সমাজ চেয়েছিল!
পাঁচভূতে-পেত্নীতে যা লুটেছে বহুদিন চেটেপুটে খেয়েছে নির্দ্বিধ নিংড়ানো রস
আজ তারা তর্ক-তত্ত্ব ক'রে-করে বিচার ও বিবেচনা সিকিসত্য-অর্ধসত্যে আশ্চর্য শোভন—
মিথ্যারও চেয়ে সাংঘাতিক—
তথনই হয়েছে, এখন তো আরও হবে: আদ্যশ্রাদ্ধে নুমুণ্ডমালিনী!

তোমার তাতে কী আর আসে যায়!
তাই শুধু অতঃপর ছাইভস্ম-পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাওয়াটা!
যত সত্বর হয় তত মঙ্গল!—এভাবেই এই শেষ ভূমিকাদলনে সক্ষম (তোমার)
আমরা অবশিষ্ট মাত্র ক'জন সত্যকার গুণগ্রাহী শুভাশুধ্যায়ী প্রচুর হাততালি দিয়ে ব'লে উঠব:
সাবাস এ স্ব-আগত বি-দায়! এই যথাপ্রস্থানেই যেন তোমার প্রকৃষ্ট ক্ষমতা হলো প্রমাণিত,
হে সাব্যস্ত অক্ষম পদার্থ এতদিন!]

জীবনযাপন

সৈয়দ সমিদুল আলম

এত স্ফুলিঙ্গ যদি ওড়ে হায় কোথায় রাখি শির
রাত ফেটে চৌচির

বৃক্ষেরা কাঁপে সবুজ চাদর জড়িয়ে, ধরেছি ছাতা
তবুও বাঁচে না মাথা

হে আমার প্রিয় স্বপ্ন মায়া ছিন্ন তন্তুজাল
আহুর কঙ্কাল—

আমাকে ছুটিয়ে কতদূর যাবে কোন্ আড়ালের দিকে
ঘরে বউ-ঝিকে

নগ্ন থেকে নগ্ন ক'রে দিয়েছ মড়ার খুলি
দুই চোখে অঙ্গুলি

ক্রমহননের ঝাঁঝালো ছুরির সুতীব্র গতি ধার
হে বিশ্ব আমার

এই দেহ, এই ক্রোধ, এই দিন ও রাত্রি···
স্খলিত জীবনযাত্রী

ভাঙো। ভেঙে চুরমার করো শবের জীবনযাপন
দূর-দূর আলাপন

ছড়িয়ে দাও ছলাৎছল তরণী জুড়ে দূরে
এ-প্রাণ থেকে ও-প্রাণ ছুঁয়ে অন্য প্রাণে ঘুরে।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত এবং হিন্দুমুসলিম সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মুসলমানের করণীয় কর্তব্যের বিচার

পুলকনারায়ণ ধর

ভারতীয় সংবিধানের প্রারম্ভেই, প্রস্তাবনায় ভারতকে "ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক" দেশ হিসাবে গঠন করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলের মধ্যে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। সেই সময়ে কিন্তু "ধর্মনিরপেক্ষ" বা "সেক্যুলার" শব্দটি সংবিধানে স্থান পায় নি। পরবর্তী কালে ১৯৭৬ সালে জাতির এক নতুন সংকটের মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে "ধর্মনিরপেক্ষ" কথাটি ১৯৪৯ সালে রচিত ও গৃহীত প্রস্তাবনার গায়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় "সেক্যুলার" শব্দটি সংযোজিত হয় স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরে

স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে: ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বা রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করার সংকল্প ১৯৪৯ সালেই আমরা গ্রহণ করতে পারি নি কেন? স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর "সেক্যুলার" হবার সংকল্প প্রস্তাবনায় সংযোজিত হল। তাহলে কি এই দীর্ঘ সময় ধরে আমরা সেক্যুলার ছিলাম না? বা আমাদের কর্মে, মননে ও রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে আমরা সেক্যুলারিজমের চর্চা করে আসি নি?

আসলে সেক্যুলারিজমের চর্চা ১৯৪৯-এ আমাদের চিন্তাভাবনায় ছিল না। দু-একজন নেতার ভাবনা-চিন্তায় তা ধরা পড়লেও এর তাৎপর্য উপলব্ধি করার মনস্কতা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মুহূর্তে আমাদের ছিল না। সেক্যুলার শব্দটির ব্যবহার তখনকার রাজনৈতিক মানসিকতায় ভারতীয় জনগণের বিশেষত হিন্দুদের কাছে সংখ্যালঘু- বা মুসলমান তোষণ-নীতি বলে বিবেচিত হত। সুতরাং এর গ্রহণ-যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় ছিল।

মুসলমানদের বা পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতার অভিযোগ তুলে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল

(১৯৪৮, ৩০ জানুয়ারি)। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে জনবিনিময়ের দাবিতে উত্তেজিত আলোচনা তখনও অব্যাহত। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের অবিরাম স্রোত ও দুঃখদুর্দশার কাহিনী কাউকে সুস্থিত হতে দিচ্ছে না। পানজাব, বিহার আর বাঙলার দাঙ্গা-হাঙ্গামার স্মৃতি তখনও মুছে যায় নি। ঘৃণা আর ধর্মবিদ্বেষ মানুষের মনকে আছন্ন করে রেখেছে। এই অবস্থায় নিজেদের সেক্যুলার ঘোষণা করার সাহস আমরা দেখাতে পারি নি। রাজনৈতিক অঙ্কের হিসেব কষে তদানীন্তন কংগ্রেস দলও সেই ঝুঁকি নেয় নি, বরং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়াটাই লাভজনক বলে বিবেচিত হল। (১৯৪৯, ১২ জুলাই)।

সে সময় সেক্যুলার শব্দটি সংবিধানে অনুপস্থিত থাকলেও ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকাঠামো আজ যতখানি সেক্যুলার, সেদিনও ততখানিই সেক্যুলার ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যে ভারতকে (দ্বিখণ্ডিত হলেও) ইংরেজের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলাম, সেই ভারত ছিল সুসংবদ্ধ-উন্নত-শাসনব্যবস্থা-বিধৃত জাতীয়-রাষ্ট্রচরিত্র-সম্পন্ন ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক সম্ভাবনা এবং বাজার ছিল বিরাট। ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা বুর্জোয়াশ্রেণীর লক্ষ্য ছিল এই বাজারের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো ও আর্থিক সমৃদ্ধি সাধন করা।

সুতরাং ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র ছিল লক্ষ্য। ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো গ্রহণ করাই ভালো বিবেচনা করল। ভারতের মতন বহুজাতিভিত্তিক ও বহুধর্মভিত্তিক দেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো রচিত না হলে সমগ্র দেশের ঐক্য বিপন্ন হবে—এই বোধ তাদের ছিল।

পক্ষান্তরে পাকিস্তান ছিল এই সমস্যা থেকে আপেক্ষিকভাবে অনেকটাই মুক্ত, যদিও শেষরক্ষা পাকিস্তান করতে পারে নি। পাকিস্তানবিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের অবশ্য এসব চিন্তাভাবনার বালাই নেই, কারণ আধুনিক বুর্জোয়া শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের চেয়ে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হওয়ার দিকেই তার আর্থিক ঝোঁক বেশি। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করতে তার কোনো অসুবিধা হয় নি। পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সাধারণ সামাজিক চেতনার সঙ্গে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের সংঘাত বেশি নেই।

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর দ্বন্দ্ব

ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর একটা দ্বন্দ্ব আছে। এই দ্বন্দ্ব আমাদের মনে রাজনৈতিক ধন্দের সৃষ্টি করছে। এখানে যেমন একদিকে আছে আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণী, তেমনি অপরদিকে আছে সামন্তশ্রেণী। আধা-বুর্জোয়া আধা-সামন্তশ্রেণী সর্বদা একই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না। প্রায়ই তারা বিপরীতমুখী স্রোতের ধারায় বিপরীত স্বার্থসাধনে চলতে চায়। এর ফলে রাষ্ট্রকাঠামোর নানা বিপরীত-ধর্মিতার সামঞ্জস্য ঘটাতে হয়। অনুন্নত ও উপজাতি আর্থসামাজিক কাঠামো সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার আরও একটি দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র।

প্রথম থেকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির দুটি বিপরীতমুখী ধারা

ইংরেজ আমাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম থেকেই তাদের স্বার্থে 'ঐক্যবদ্ধ' ভারত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিল। তারা ওয়েস্টমিনস্টার মডেলে শাসনব্যবস্থা চালু করে দিল। গণতন্ত্র, সংসদ, আলাপ-আলোচনার টেবিল, কেতাদুরস্ত বৈঠক—সবই আমাদের হল। কিন্তু এ সবই হল বাইরে থেকে আমদানি করা ফুলের টবের মতন। সাধারণ মানুষের

কর্মপ্রক্রিয়া আর চেষ্টার মধ্য দিয়ে এগুলি গড়ে ওঠে নি। এই পরিকাঠামোর নিজস্ব ধারা এবং রাজনীতির কৌশল আয়ত্ত করে তার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা কতিপয় উচ্চমধ্যবিত্ত ভারতীয়র পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। আপামর ভারতীয় জনতা ছিল নির্বাক নির্লিপ্ত দর্শক। আধুনিক শিক্ষা এবং মনন থেকে তারা ছিল বহু যোজন দূরে অবস্থিত। সুতরাং প্রথম থেকেই আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির (পোলিটিক্যাল কালচার) ছিল দুটি বিপরীতমুখী ধারা। একটি উচ্চশিক্ষিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পাশ্চাত্য রাজনীতির ধারা, এবং অপরটি আধুনিকশিক্ষাদীক্ষা-বঞ্চিত ধর্ম এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা। অর্থাৎ সামাজিক ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা—এই দুয়ের দ্বন্দ্ব ভারতীয় সমাজের মূল সমস্যা। এই সমস্যাই আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বিপন্ন করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগেই এ বিষয় উপলব্ধি করে বলেছিলেন: 'পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবল-মাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।' ("আত্মশক্তি", ভাদ্র ১৩১১)।

আজ হয়তো দেশের ভাষায় বক্তৃতা হয় বা বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, কিন্তু যে রাজনৈতিক পরিভাষা এবং ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা সাধারণ মানুষের নাগালের বহু বাইরে। তাই আশু ফল-লাভের উদ্দেশ্যে ধর্ম, কুসংস্কার আর ঐতিহ্য মন্থন করে সাধারণ মানুষকে রাজনীতির স্বার্থে আবেগাপ্লুত করতে হয়। ক্ষমতা অটুট রাখার স্বার্থে সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় বিভেদ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির দুটি বিপরীতমুখী ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতবর্ষ—ভারত ও পাকিস্তান।

রাজনৈতিক ক্ষমতাভোগের লড়াইয়ে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ১৮১৫ সালে

ইংরেজ তার 'প্রতিনিধিত্বমূলক' শাসনব্যবস্থার ধারণা এদেশে যেভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে, তার ফল হল ভয়ংকর। প্রথম প্রয়াসেই শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ রোপণ করল। গ্রামে গঞ্জে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাভোগের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (১৮১৫-১৮৮৭) ভবিষ্যতের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদসৃষ্টিকারী আইনের ভিত্তি স্থাপনের কাজ করল। এইসমস্ত আইনের সাহায্যে আর চাকুরির সূত্রে হিন্দুরা ইংরেজদের পাকশালা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আসলে, শিক্ষিত ধনবান হিন্দুরাই এই সুবিধা অর্জন করেছিল। দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দুরা ছিল এই ব্যবস্থা থেকে বহু দূরে। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ও দরিদ্র হিন্দুদের মতনই ছিল বঞ্চিত। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমান নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে এই বঞ্চনাকে শুধু মুসলমান সমাজের বঞ্চনা এবং তাদের প্রতি অবিচার বলে প্রচার করলেন এবং রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের পৃথগন্নের ব্যবস্থা করলেন। দরিদ্র মুসলমান আর দরিদ্র হিন্দুর মধ্যে ক্রমশ দারিদ্র্যের ঐক্য শিথিল হয়ে পড়ল।

দারিদ্র্যের ঐক্য আর রইল না—এল ঐক্যের দারিদ্র্য

ধর্মের জিগিরে ঐক্যের দারিদ্র্য প্রকট হতে শুরু করল। মুসলমানরা হিন্দুদের ঈর্ষা করতে শুরু করলেন। স্বার্থপরতা আর বিরোধপরতাকেই উন্নতির পথ বলে ধরে নিলেন। ইংরেজ সরকারেরর "চাপরাস" বুকে বাঁধবার জন্য মুসলমানরাও মরিয়া হয়ে উঠলেন।

যে গর্ব আর অহংকার বুকে নিয়ে এতদিন তাঁরা ইংরেজের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলছিলেন, হিন্দুদের পথ অনুসরণ করতে গিয়ে তা বিসর্জন দিলেন, ইংরেজের পাতা ফাঁদে পা দিলেন। ভারতবর্ষের মুসলমানরা যদি তাঁদের ইংরেজ-বিরোধিতার সংকল্পে অবিচল থাকতে পারতেন, তবে ভবিষ্যতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁদের হাতেই থাকত। দরিদ্র হিন্দু আর দরিদ্র মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যেতেন না। মুসলিম নবজাগরণের স্বপ্ন দেখিয়ে যে-সমস্ত উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান নেতা ইংরেজ-সৃষ্ট সংসদীয় কারাগারে মুসলমান সমাজকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা প্রকৃত মুসলিম স্বার্থ কতখানি বিবেচনা করেছিলেন, তা মুসলমানদেরই বিচার করতে হবে। সমস্ত মুসলমান সমাজকে হিন্দুদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় টেনে নামিয়ে তাঁরা সমস্ত দেশের ক্ষতি করেছেন, হঠকারী রাজনীতির আমদানি করেছেন, যার পরিণাম রক্তক্ষয়ী দেশভাগ।

গ্রামীণ স্থিতিশীলতায় এল নতুন চমক

১৯০৯ সালে মর্লে-মিনটো সংস্কারের ফলে আংশিক নির্বাচনব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এর ফলে প্রাদেশিক কাউন্সিলে বাছাই-করা জনগণের মধ্য থেকে নির্বাচক-মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সুযোগ পান। জেলায়-জেলায় রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা দেয়, এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর রাজনৈতিক কূট কৌশল শুরু হয়। গ্রামীণ স্থিতিশীলতায় নতুন চমক লাগে।

১৯১৯ সালে মনটেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের মাধ্যমে এই নির্বাচনব্যবস্থা আর ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটে। জনপ্রতিনিধিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সরকারি কর্মচারীরা জনপ্রতিনিধিদের অধীন হয়ে তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকেন। জমিদারশ্রেণীর মানুষদের—যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু—গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় অভিভাবক হিসাবে রাজ্যশাসন-ব্যবস্থায় তাঁরা ব্রিটিশদের মূল্যবান সহায়ক হয়ে ওঠেন। জমি এবং অর্থ সমাজে প্রতিপত্তিবৃদ্ধির সহায়ক বরাবরই ছিল, এখন তার সঙ্গে রাজনৈতিক মর্যাদা আর ক্ষমতা যুক্ত হল। হিন্দু-মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ক্ষমতাও জমিজমা ও আর্থিক কৌলীন্যের অনুপাতে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে নির্ধারিত হতে লাগল।

মনটেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের ফলে মুসলমানদের অধিকার ও আধিপত্য বৃদ্ধি

প্রকৃত পক্ষে মনটেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পরই ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকার আর আধিপত্য বৃদ্ধির সূচনা হয়। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের ওপর ভিত্তি করে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর উত্তরপ্রদেশ, বাঙলা প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে টেক্কা দিতে সমর্থ হন। ১৯০৯ সালের ভারত-সরকারের আইন মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের দরজা খুলেই দিয়েছিল। তারও পূর্বে ১৯০৫ সালের "বঙ্গভঙ্গ" প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কারণে ঘটলেও মুসলমান জনসাধারণের বিশেষ সুবিধার কথা ইংরেজ ভোলে নি। তাই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। ১৯১৬ সালে লখনউ চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেস পৃথক ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিল। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মিলন ঘটলেও এই চুক্তি ছিল গান্ধীজীর মতে শিক্ষিত ও বিত্তবান হিন্দু এবং শিক্ষিত ও বিত্তবান মুসলমানদের ক্ষমতা-লাভের চুক্তি। সাধারণ হিন্দু-মুসলমান ছিল দূরে।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানীদের প্ররোচনায় পরস্পরের প্রতি এতই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন যে ওপরতলার নেতারা কখনও-কখনও পারস্পরিক স্বার্থে মিলিত হলেও সেই বিদ্বেষ আর

সন্দেহ কিছুমাত্র দূর হল না। লখনউ চুক্তির প্রায় অব্যবহিত পরে ১৯১৭ সালের ২২ সেপটেম্বর বিহারে আরা জেলায় এক বীভৎস দাঙ্গায় সমস্ত দেশ শিউরে ওঠে। ১৯১৮ সালে উত্তরপ্রদেশের শাহারানপুর জেলার কাতারপুরে একই রকম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এই-সমস্ত দাঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের মোল্লা আর ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত শক্ত করে। মূল রাজনীতির স্রোত থেকে মুসলমানদের বার-বার দূরে ঠেলে রাখতে ইংরেজকে সাহায্য করে। এবং সাধারণ মুসলমানরা ভাবতে লাগলেন যে পৃথক সংসার স্থাপন করেই তাঁরা সুখে শান্তিতে থাকবেন।

একদিকে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বৈর সম্পর্ক, এবং অন্যদিকে ইংরেজদের প্রতিও তাঁদের অবিশ্বাস দেখা দিল। এর ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝলেন তাঁদের আরও বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। হ্যামলিনের বাঁশি হাতে এই 'ঐক্যে'র সুর বাজাতে লাগলেন গোঁড়া মোল্লারা। মুসলিম নেতাদের সাধ্য কি এঁদের উপেক্ষা করেন!

ইংরেজদের সম্পর্কে মুসলিম নেতাদের মোহমুক্তি

মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহমেদ খানের ব্রিটিশপন্থী নীতি মুসলমানদের একাংশকে আকৃষ্ট করেছিল ঠিকই, এবং ইংরেজরাও মুসলমানদের এই নীতিতে আশ্বস্ত বোধ করেছিল। প্রতিদানে মুসলমান-দের বিশেষ দেখভাল করার আশ্বাস প্রদান করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা ক্রমশ উপলব্ধি করেন যে, ইংরেজরা আর-দশটা ঔপনিবেশিক শক্তির মতোই স্বার্থলোলুপ, অ নির্ভরযোগ্য শক্তি। শতাব্দীর শুরুতেই ইংরাজ-দের সম্পর্কে মুসলমান নেতাদের মোহমুক্তি শুরু হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগ প্রত্যাহার করার পর মুসলমানরা ইংরেজদের মুসলমান-প্রীতির ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন। ইউরোপের ঘটনাবলীও মুসলমানদের চিন্তাভাবনাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করতে শুরু করে। ইতালি-কর্তৃক লিবিয়া দখল, মরক্কোতে ফরাসি আধিপত্যের বিস্তার, বলকান যুদ্ধ, পারস্য এবং তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করার চক্রান্ত (রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে)—এইসব ঘটনাবলী মুসলমান জনচিত্তকে ধর্মীয় কারণে উদ্বেলিত করে তোলে।

ইংরেজরা এই-সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি যে মনোভাব ও নীতি গ্রহণ করেছিল, তাতে মুসলমানদের বিশ্বাসে চিড় ধরে। ইংরেজ নীতি মুসলমানদের তৃপ্ত করতে পারে নি। কিন্তু ইংরেজদের প্রতি মুসলমান-দের সন্দেহ বাড়তে থাকলেও গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে হিন্দুদের সম্বন্ধেও তাঁদের আশঙ্কা দূর হয় নি।

গান্ধীর প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অভিনব রাখীবন্ধন

এদিকে জাতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে কতকগুলো ঘটনা ঘটল যার ফল হল সুদূরপ্রসারী। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ভারতসরকার "রাওলাট অ্যাক্ট" প্রবর্তন করে জাতীয়তাবাদী-ব্যক্তিদের ওপর দমনপীড়ন নামিয়ে আনে। 'রাউলাট অ্যাক্টে'র বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে আগত নতুন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। 'রাওলাট' বিলের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেস আর জাতীয় আন্দোলনকে নতুন পথে পরিচালিত করে। এই গণ-আন্দোলন আর গণচেতনার বিকাশ-কালে ঘটল আরও একটি নারকীয় ঘটনা। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরে "জালিয়ানওয়ালাবাগ" হত্যাকাণ্ড। এদিকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি ব্রিটেন আর তার মিত্রশক্তিগুলি যে বৈর মনোভাব গ্রহণ করে, তার ফলে ভারতের মুসলমান সমাজে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এই আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে যে তুরস্ক সম্রাট বা

খলিফার মর্যাদা হ্রাস করবার-জন্য ইংরেজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এই-সমস্ত ঘটনা হিন্দু, মুসলমান, শিখ—সকল ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে ব্রিটিশের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষের একটি সাধারণ ভূমিতে এনে দাঁড় করাল। শুরু হল খেলাফত আন্দোলন। গান্ধীজী এই বিশেষ সুযোগটিকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য-প্রচেষ্টার জন্য ব্যবহার করতে উদ্যোগী হলেন। ভারত জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল প্রবাহ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নতুন রাখীবন্ধন সৃষ্টি করল। জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে গ্রামগঞ্জের মুসলমানরাও যোগ দিলেন। গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ভাবগত ঐক্য সৃষ্টির একটা প্রয়াস গান্ধীজী করেছিলেন। কিন্তু মূলত ধর্মভিত্তিক ছিল বলে এই আন্দোলনকে বিশুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত করা তখনকার পরিস্থিতিতে ছিল প্রায় অসম্ভব সাধনা।

ধর্মভিত্তিক খিলাফত-আন্দোলন স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হয় নি

খিলাফত-আন্দোলন মুসলমান মানসিকতার দুর্বলতাও চিহ্নিত করেছিল। ধর্মের বাইরে তাঁরা অন্য কোনো ধারণাকে স্থান দিতে তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। কামাল পাশার নেতৃত্বে (১৯২২ নভেমবর) খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ভারতের মুসলমানরা ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যে ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচী ও সংস্কারসাধনের চেষ্টা তিনি করেছিলেন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। জড়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে তাঁরা সঙ্গত মনে করেন নি।

খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনও মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। কিন্তু খিলাফত আন্দোলন মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করে দিল। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে উত্তর-প্রদেশে "আর্যসমাজে"র নেতৃত্বে "শুদ্ধি" আন্দোলনের সূত্রপাত হয় (১৯২৩)। ১৯২৪ সালের ১২ই সেপটেমবর লখনউর আমিনাবাদ পার্কে আরতি-নমাজ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা ধর্মীয় জিগির তুলে দাঙ্গার সূত্রপাত করে। লখনউয়ের স্থানীয় রাজনীতি পরবর্তী সময়ে এই সাম্প্রদায়িক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এই ঘটনা এমন একটা সময়ে ঘটেছিল যখন জাতীয় আন্দোলনে চলছে এক দিশাহীন পরিস্থিতি। বলিষ্ঠ-তীক্ষ্ণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অভাবে নেতাদের প্রায় চাকরি যাবার অবস্থা। কংগ্রেসের অবস্থা হাল-ভেঙে-পড়া-বলদের মতন। জাতীয় স্তরে হতাশা আর শৈথিল্য মানুষকে গ্রাস করেছে।

এই সময় অবশ্য চিত্তরঞ্জন দাশ আর মোতিলাল নেহরু নতুন কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁদের স্বরাজ্য দলের মাধ্যমে (১৯২২, ডিসেমবর)। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প তখন মানুষের মনকে দুর্বল করে দিয়েছে। স্বরাজ্য দলের উত্থান আর প্রভাবকে খর্ব করতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমর্থ হল। লখনউয়ের রাজনীতিতে নেহরু পরিবারের অসাম্প্রদায়িক নীতিকে খর্ব করার জন্য মদনমোহন মালব্যর মতন নেতা এগিয়ে এলেন। স্বরাজ্য দলের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ককে তিক্ত আর ছিন্ন করার জন্য ১৯২৭ সালে সংঘটিত হল "রামলীলা" দাঙ্গা। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে স্বরাজ্য দলকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। মুসলমান ভোট আর হিন্দু ভোটের মেরুকরণের চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্বরাজ্য

দল নির্বাচনে করুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। ভোটের রাজনীতির জন্য স্বরাজ্য দলের হিন্দু নেতারা সাম্প্রদায়িক বিষয়ে দোদুল্যমান মনোভাব গ্রহণ করায় মুসলমান আর হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস অনেকাংশেই হারিয়েছিলেন।

আজও সেই বৃদ্ধ ঘোটকের তেজ কিছুমাত্র স্তিমিত হয়নি

বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে আজ ভারতের বুর্জোয়া-ফিউডাল নেতারাও সেই অবস্থায় পড়েছেন। রাজনৈতিক-দিশাহীন এই নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক বিষয় নিয়ে চোরপুলিশ খেলায় মত্ত। আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাকে চাপা দিতে 'বাবরি-মসজিদ' বিষয়টি খুঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোট মেরুকরণের নতুন চেষ্টা শুরু হয়েছে। সেই ১৯২৫-এ মালব্য পরিবার সাম্প্রদায়িক ঘোড়া ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন—এলাহাবাদের রাজনীতিতে নেহরু পরিবারের প্রভাব কত ক্ষীণ। আজ ১৯৯০ সালেও সেই বৃদ্ধ ঘোটকের তেজ কিছুমাত্র স্তিমিত হয় নি।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও নববইয়ের নির্বাচনে জয়-পরাজয়কে (যা সেই এলাহাবাদ দিয়েই শুরু হয়েছিল) গণতন্ত্রের জয় ও ব্যক্তিতন্ত্রের পরাজয় বলে চিহ্নিত করে প্রগতিশীলতার কেতন উড়িয়ে দিয়েছেন 'অভ্রভেদী রথে'। পরিণামে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় পরস্পরের থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব রচনা করে চলেছে। এবং উভয় সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীরা তাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাতাস সঞ্চালন করছেন।

অবশ্য মুসলমানদের একটা অংশ অনুভব করেছিলেন যে, বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন ও দলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে না পারলে পরিণামে মুসলমান জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে, এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পথ ছেড়ে দেওয়া হবে।

মদনমোহন মালব্য আর লালা লাজপৎ রাইয়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রসার সত্ত্বেও খিলাফতখ্যাত সৌকৎ আলি আর মহম্মদ আলি নিজেদেরকে কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত রাখার চেষ্টা করে গেছেন। "তানজিম্" আর "তবলিগ্" নামক সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের স্পর্শও তাঁরা এড়িয়ে চলেছিলেন। এদিকে হিন্দুসভার প্রতি কংগ্রেসের আকর্ষণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানরা ক্রমে-ক্রমেই কংগ্রেসের দুর্বলতার জন্য বিভ্রান্ত, আশাহীন হয়ে পড়েন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকে। এসব সত্ত্বেও মহম্মদ আলি চেষ্টা করে যান—কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্ধ্বে রাখতে। তাঁর মতে 'The Congress is, and must remain the only political organisation, and the Mahatma alone can be expected to guide it and through it the Nation to victory…Let the Muslim League and the Hindu Mahasabha both perish, and let the Congress and the Nation survive'[২]

কংগ্রেসের অজান্তেই অবস্থানের সুযোগ ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের

হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক জঙ্গিপনা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের পক্ষে তা রোধ করা সম্ভব ছিল না। তার একটি কারণ—কংগ্রেসের মধ্যেই জাতীয়তাবাদের মুখোশ পরা বহু সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতা ছিলেন। এটা লক্ষ করার বিষয় যে একই সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন আর কংগ্রেসের সভ্য হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংগঠন আর কংগ্রেসের সদস্য থাকা সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসের আদর্শ ও সাংগঠনিক ব্যাপ্তির কাঠামোতে হিন্দু-সাম্প্রদায়িক ফিউডালরা জায়গা

করে নিয়েছিল।

পক্ষান্তরে, মুসলমানদের দাবি আর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুব সহজ। ব্রাহ্মণ্য কূটকৌশলের ও দ্বার্থবোধক আদর্শের কুহেলিকায় তা আবৃত ছিল না। জওহরলাল নেহরুর কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলছেন: 'Muslim communal leaders said the most amazing things and seemed to care not at all for Indian nationalism or Indian freedom; Hindu communal leaders, though always speaking apparently in the name of nationalism, had little to do with in practice, and incapable of any real action'.[৩]

প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় মৌলবাদীরা সর্বদাই জনসংযোগের বলে বলীয়ান ছিল

মুসলমান নেতারা যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন তাঁরা ছিলেন উচ্চবিত্তশ্রেণীর মানুষ। তাঁরা তাঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বাইরে পা ফেলেন নি। জনগণের সঙ্গে তাঁরা কোনো যোগ রেখে চলেন নি। তাঁদের কার্যপদ্ধতি ছিল, নেহরুর ভাষায়, '... One of drawing-room meetings and mutual arrangements and pacts, and at this game their rivals, the communal leaders, were greater adepts'.[৪] অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় মৌলবাদীরা সর্বদাই জনসংযোগের বলে বলীয়ান ছিল। তারা "জাতীয়তাবাদী" মুসলমান নেতাদের কদম-কদম পিছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

১৯২৬ সালের পর গান্ধীজীও একটু-একটু করে নিজেকে রাজনীতির অঙ্গন থেকে গুটিয়ে আনতে শুরু করেন। দ্বিধা আর অন্তরদ্বন্দ্বে দীর্ণ কংগ্রেসের দুর্বলতার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করল হিন্দু-মহাসভার প্রবক্তা ও সংগঠকরা। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। মুসলমানদের মধ্যেও শ্রদ্ধানন্দকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু হয়। ১৯২৭ সালে কলকাতা পৌরসভার একটি সভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে "জাতীয় নেতা" হিসাবে আখ্যা দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণে একজন মুসলিম সদস্য আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জাতীয় নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সাম্প্রদায়িক নেতা। এটাই নাকি ছিল তখনকার মুসলিম সমাজের অনুভূতি।[৫]

এদিকে পাটনায় হিন্দুমহাসভার বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে ঘোষণা করা হয়: 'I have no value, not the least, for that Swaraj where the Hindu declines daily both in numbers and in influence. I can only imagine that where the Hindu in his forefathers' land of Hinduism shall be prospering and supreme···' এদের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠল না। কোনো বিকল্প আদর্শ প্রচারিত হল না। শুধু পারস্পরিক সাংগঠনিক বলবৃদ্ধির কৌশল আয়ত্ত করতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কংগ্রেস আর গান্ধীজীর প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস আর অটল রইল না। সন্দেহ আর আশঙ্কা নিয়ে তাঁরা কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে দূরে সরে রইলেন। কিন্তু এতে তাঁরা মারাত্মক ভুল করলেন। আসলে, মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক নেতারা ঐক্যবদ্ধ মুসলমান শক্তিকে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে ফিরতে দিতে চায় নি। সাধারণ মুসলমানদের কংগ্রেসের হিন্দুঘেঁষা রাজনীতির প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়েছিল, তারা এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করল। ড. আনসারির

সাবধানবাণী বিফল হল। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশে বলেছিলেন: 'To leave the Congress would be to commit political suicide.' ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, মহম্মদ আলির মতন নেতাও বলেছিলেন: 'We refuse to join Gandhi because his movement is not a movement for complete independence of India but for making seventy millions of Indian Mussalmans dependent on the Hindu Mahasabha.'[৬]

প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব খর্ব করার মতো ক্ষমতা যাদের ছিল তাদের যথার্থ মূল্যায়ন হয় নি

কিন্তু কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণভাবে সমস্ত মুসলমান-নেতা ছেড়ে যান নি। ছেড়ে যাওয়াটা চরম বিপদ ডেকে আনবে—এটা তাঁরা অনেকেই বুঝেছিলেন। এত বড়ো একটা সংগঠন হিন্দু-মহাসভার মতো সাম্প্রদায়িক দলের হাতে তুলে দেওয়াটা হবে মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কাজ। এই সত্যটা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। এক্ষেত্রে যাঁরা প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন খান আবদুল গফফর খান বা সীমান্ত গান্ধী। তাঁর নেতৃত্বে হাজার-হাজার মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী (খুদা-ই-খিদমদগার) আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। খুদা-ই-খিদমদগারের স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর ইংরেজ পুলিশ আর সৈন্যরা পেশোয়ারে যে নির্মম অত্যাচার করেছিল পৃথিবীর যে-কোনো দেশের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের ভাগ্যে তাই ঘটে। ভারতের মুসলমানরা এঁদের জন্য গর্ব বোধ করতে পারেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানদের একই শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। ফৈজ মহম্মদ, আবদুল রাজ্জাক, মহম্মদ নাকির—এইসব অসমসাহসী স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেনের মতো বীরদের সঙ্গে উচ্চারিত হবার যোগ্য।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনদের মতো সিন্ধি এবং বালুচরাও আবদুল গফফর খানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সমরু আল্লাবক্স মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৩৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের নেতা খুরুকে পরাজিত করে মুখ্যমন্ত্রী হন। মুসলিম সাম্প্রদায়িকরা ১৯৪৩ সালের ১৪ মে তাঁকে হত্যা করে।[৭]

এইসব আত্মত্যাগ আর আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য হিন্দু বা মুসলমান নেতারা সাধারণ মানুষের কাছে তেমনভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। সমস্ত কিছুই নিছক সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার ফলে যে-নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আন্দোলনগুলির জন্ম হয়, তা অচিরেই বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মোকাবিলা করার মতন অবস্থা বাস্তবে কংগ্রেসের ছিল না। জওহরলাল নেহরু পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন: 'The want of clear ideal and objectives in our struggle for freedom undoubtedly helped the spread of communalism. The masses saw no clear connection between their day-to-day sufferings and the fight for Swaraj. They fought well enough at times by instinct.'[৮]

ধর্মকে পরিণত করা হয় রাজনৈতিক অস্ত্রে

দেশের সাধারণ চাকরি আর রুজিরোজগারের ক্ষেত্র ছিল সঙ্কুচিত। প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র এবং অসম। স্বভাবতই, যে-কোনো সাম্প্রদায়িক দলই এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের সহজ সমর্থন

আদায় করার চেষ্টা করবে। 'Everyone of the communal demands put forward was for jobs' (নেহরু)। উচ্চবিত্তদের জন্য চাকরি আদায় করা এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করার উদ্দেশ্যে পৃথক ভোটব্যবস্থা বা বিশেষ সংরক্ষিত আসনের দাবি ছিল খুবই সংকীর্ণদাবি। কিন্তু এইসব দাবিকেই সাধারণ মুসলমানদের দাবির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতারা রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছিলেন। ধর্মকে সেখানে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করা হয়। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখবার জন্যই ধর্মীয় উন্মাদনার ঢেউ জাগিয়ে তোলা হয়।

ত্রিশের দশকে ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা এবং ভারতে ক্রমবর্ধমান কৃষক-শ্রমিক অসন্তোষ এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্তার ঘটলে ব্রিটিশ সরকার দ্রুত গতিতে শাসনসংস্কারে মনোযোগী হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডের "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" (১৯৩২, অগস্ট ৪) নীতিকে ভিত্তি করে ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) প্রবর্তিত হল। এই আইনের ফলে শুধু মুসলমানদের জন্য নয়—শিখ, ভারতীয় খ্রীষ্টান এবং অ্যাংলো-ইনডিয়ানদের জন্যও পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রথা ভারতীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে প্রোথিত হল। স্বাধীন ভারতের নবসংবিধানও প্রায় ভারতশাসন আইনের (১৯৩৫) "কার্বন কপি"।

মুসলমান ও হিন্দুর রাজনৈতিক ঐক্য যে প্রায় একরকম অসম্ভব, তা কংগ্রেস নেতারা প্রায় মেনে নিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে যোগ দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিকে শক্ত করা হল। হিন্দু আর মুসলমান দুটি পৃথক জাতি বলে মুসলিম লীগও প্রচার শুরু করল। দেশভাগের প্রস্তাব ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের প্রস্তাবে গৃহীত হল। মুসলিম লীগের এই প্রস্তাব হিন্দু মহাসভা বা উগ্র হিন্দুদের কাছে ভারতবর্ষকে শুধু হিন্দুদের বাসভূমি বলে প্রচার করার পথ প্রশস্ত করে দিল। মুসলমানরা যে বহিরাগত তথা বিদেশী, এই ধারণা বহু মানুষের মনে তারা বিশ্বাসে পরিণত করতে সক্ষম হল।

সঠিক উপলব্ধি ছিল রবীন্দ্রনাথের

এই ব্যাপারটি প্রথমে সংখ্যালঘু বা মুসলমানদের দিক থেকে বিচার করে দেখা যাক। বিশাল ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুদের যে দাপট ছিল, তাতে মুসলমান বা শিখদের নিরাপত্তাবোধ মাঝে-মাঝে অস্থিত হতে পারে, এবং সেই কারণে আত্মরক্ষামূলক নানা দাবিদাওয়া উত্থাপিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে হিন্দুরা যদি মুসলমানদের আশঙ্কার পীড়া দূর করার আন্তরিক চেষ্টা করতেন, তবে মৌলবাদী মুসলমানরা মুসলমান জনগণকে জুজুর ভয় দেখিয়ে কবজা করতে পারত না।

কিন্তু হিন্দুরা তা করেন নি। সংখ্যার প্রবল জোরে তাঁদের একটা প্রবণতা ছিল সবাইকে তাঁদেরই বলয়ে নিয়ে আসা। সে সময় এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এত সত্য করে আর কেউ উপলব্ধি করেন নি, বা করলেও রাজনৈতিক কারণে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন নি।

একটু দীর্ঘ হলেও এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্মরণযোগ্য। প্রায় আশি বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

'হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্য-কে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।···আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই।···তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আত্মসঙ্গিক বলিয়া

মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুই পথের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততখানি পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতখানি বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগ-বাঁটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

'মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়াই আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই।···মুসলমানের একথা বলা অসংগত নহে যে, আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

'কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক-রকম করিয়া মিলিয়াছিলাম যে আমাদের মধ্যে-কার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না।···একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।'[৯]

হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের পদমানশিক্ষার পার্থক্য এতই বেশি ছিল যে এই বৈষম্যটি দূর করবার জন্য তাঁরা অনেক বেশি-বেশি করে নানা দাবি উপস্থিত করতে থাকেন। এই দাবি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত বলেই মনে করেছিলেন। গান্ধীজীও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দিয়েই মুসলমানদের বিচার করেছিলেন। তিনি তাদের জয় করতে উৎসাহী ছিলেন, তাদের সঙ্গে দাবিদাওয়া নিয়ে দরকষাকষি করতে আগ্রহী ছিলেন না।

যে-কোনো দেশেই সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যা-গরিষ্ঠের এটাই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। এটাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে এতই উন্মত্ত রাজনীতির চর্চা করা হয়েছে যে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির কোনো স্থান ছিল না; বিশেষত দেশভাগের পর এই ধরনের মনোভাব পোষণ করাও ছিল বিপজ্জনক। তারই খেসারত দিতে হয়েছে গান্ধীজীকে জীবন দিয়ে। এর জন্য অবশ্য দায়ী আমাদের রাজনীতিবিদেরা যাদের ব্যর্থতা এবং নেতৃত্বের লোভ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে।

অভিশপ্ত রাজনীতির সেই ধারা আজো বহমান

বর্তমানেও আমরা এই অভিশপ্ত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নই। ইতিহাসে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল, আজকের রাজনীতিতে তার ফল ফলছে। এটা হিন্দু-মুসলমান সবাইকেই বুঝতে হবে যে নির্বাচন রাজনীতির পঙ্কে নিমজ্জিত রাজনীতিক নেতারা যে-কোনো মূল্যে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে ব্যগ্র। নির্দিষ্ট মূল্যবোধভিত্তিক স্বচ্ছচিন্তাসমৃদ্ধ কর্মসূচীর অভাবে জনচিত্তকে সাময়িকভাবে মথিত করার উদ্দেশ্যে এঁরা সাম্প্রদায়িক ভাবনার বিস্তার ঘটান। হিন্দু, মুসলমান, শিখ যে অঞ্চলের জনসংখ্যার চরিত্র যেমন সেই অঞ্চলে সেইমতো রাজনৈতিক প্রচারের ব্যাপারে সর্বদলীয় বিরল ঐকমত্য লক্ষ করা যাচ্ছে। এর ফলেই সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পুষ্ট হচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আর দাঙ্গা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ নতুন করে জঙ্গি হিন্দুত্ববাদ ভারতবর্ষে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। হিন্দু দর্শন আর হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সাযুজ্য আছে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। তবে এই "হিন্দুত্বে"র ধারক পুনার গোঁড়া চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা। এঁরা জাতিভেদপ্রথার চূড়ান্ত আর গোঁড়া সমর্থক। এঁরাই রাজস্থানের আঠারো বছর বয়সের মেয়ে রূপ কানোয়ারকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ করে প্রসন্ন হন। "হিন্দু" ধর্মকে

"সতীধর্মে" রূপান্তরণে এঁদের কৃতিত্ব অসীম।

এরই সূত্র ধরে 'শাহবানু' বিতর্ক, "রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ" বিষয়, স্যাটানিক ভার্সেস ইত্যাদি একের পর এক সাম্প্রদায়িক তাস নিক্ষিপ্ত হয়। এসব বিষয়ে এবং এদের জন্মদাতাদের সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই সতর্ক হতে হবে।

শুধু হিন্দুর নয়—শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানদেরও করণীয় কর্তব্য অনেক

প্রধানত হিন্দু-অধ্যুষিত দেশ বলে ভারতের হিন্দুদের যে অনেক কিছুই করণীয় এবং দায়িত্ব আছে একথা স্বীকার্য, এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুদের এ উপলব্ধি নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতের মুসলমান-দেরও যে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন আছে, তা আমাদের বুঝতে হবে, মুসলমানদের বোঝাতে হবে। আর এই বোঝানোর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি বর্তাচ্ছে শিক্ষিত সচেতন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

ধর্ম একটি যুগপ্রক্ষিপ্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ। প্রত্যেক আদর্শ যেমন সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং মূলকে অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবর্তিত হয়, ধর্মও তেমনি নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই বিবর্তিত হয়। ধর্ম যেখানে আচারের বালু-রাশিতে বাঁধা পড়ে যায়, সেখানে জাতির জীবনে দেখা দেয় জড়তা। ইসলাম ধর্মেও নানা মত আর আদর্শের সংঘাত ঘটেছে। নানা সংস্কার সাধনের চেষ্টা ইসলাম ধর্মের সাধকরা করেছেন। এই চেষ্টা সর্বক্ষেত্রে সার্থক হয় নি। তার নানা ঐতিহাসিক কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই সংস্কারসাধনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে কিনা, বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে মুসলমানদের তা ভেবে দেখতে হবে। ইসলামের একটি বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ধর্মেরই উত্থানের ইতিহাস প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে অনুবদ্ধ। কিন্তু নিজ ধর্মকে গতিশীল রাখতে না পারলে সেই ধর্ম পদে-পদে বাধা সৃষ্টি করে। জন্ম হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা। মুসলমানদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ নিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা করার সময় হয়েছে।

মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসঙ্গে এ. বি. শাহ বলছেন : 'It is rooted in the tradition of Islam itself and is to be found in every society where Muslims are in sizeable proportion. Unless Islam undergoes a fundamcntal transformation of the kind in different degrees, sheds its collectivist temper and confines itself to expressing the inividual's quest for the transcendental, there is little hope of Muslims being able to identify themselves with a national polity in which they do not enjoy unquestioned supremacy.[১০]

এই বিষয়টি গভীরভাবে অনুধ্যান করার যুগ-আজ উপস্থিত। হিন্দুরা যেমন এক সময় অচলায়তন থেকে বন্ধনমুক্তির আর্তি অনুভব করেছিলেন, মুসলমানদের মধ্যেও অনুরূপ অনুভূতির উন্মেষ না ঘটলে সার্বিক জাগরণ সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক কারণে যে সামাজিক বা ধর্মীয় গোঁড়ামি মুসলমানদের মধ্যে লক্ষণীয়, সে সম্বন্ধে আলোকপ্রাপ্ত মুসলমানদের নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এজন্য শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলতে হবে। তাঁরা যদি তাঁদের অনগ্রসর, সাধারণ মানুষের সঙ্গে না মিশে শুধু রুচিবান হিন্দুদের সাহচর্য বা বন্ধুত্ব অনুসন্ধানে সুখী থাকেন, তবে সাধারণ মুসলমান, বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে এঁদের কোনো প্রভাব পড়বে না। বরং এঁদের সম্বন্ধে সাধারণ

মুসলমান যুবকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্মাবে।

ভারতের মুসলমানরা আজ ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন না

আজকের ভারতের মুসলমানরা ভারতেরই মানুষ। তাঁদের পূর্বপুরুষরা ভারতবাসীই ছিলেন। কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ যুদ্ধনায়কের হাত ধরে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তার ইতিহাস আজ অন্য কোনো জনজাতির ইতিহাসে রূপান্তরিত। ভারতের জল-বায়ুতে, ভারতের মাটিতে তাঁদের জন্ম মৃত্যু—এই ঘটনাই ভারতের মুসলমানদের ভারতীয় পরিচয়লিপি দান করেছে বহু শতাব্দী ধরে।

মুসলমান রাজারাও ভারতবর্ষকে শাসন করেছেন ভারতের অধীশ্বর হিসাবেই, মুসলমান হিসাবে নন। এ কথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই বুঝতে হবে যে, এই বিশাল দেশে যেখানে অমুসল-মানদের বিপুল সংখ্যাধিক্য, যেখানে তরবারির জৌলুস দেখিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মভিত্তিক শাসন চালানো সম্ভব নয়। এটা অবাস্তব, কাল্পনিক।

ধর্ম চিরদিনই রাজনীতির অস্ত্র হিসাবে প্রয়োজন-মতো ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যুদ্ধের জিগির তুলতে ধর্মোন্মত্ততা সৃষ্টির প্রয়াস মুসলমান সম্রাটরাও করেছেন। অর্থের প্রলোভনে যেমন হিন্দু মন্দিরও ধ্বংস করা হয়েছে, তেমনি ধর্মের উত্তেজনা সৃষ্টি করেও সৈন্যবাহিনীকে ও জনসাধারণের একটা অংশকে উদ্‌বুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। ধর্মকে যুদ্ধের সহায়ক হিসাবে আহ্বান করা হয়েছে। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির সাধারণ নিয়মেই তা হয়েছে যা আজও "গণতান্ত্রিক" দেশগুলোতে হয়ে থাকে।

মুসলমান সম্রাটরা দেশের শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র অর্থে মুসলমান ছিলেন না। তাঁদের বিচার করতে হবে চিরাচরিত শাসক-শাসিতের সম্পর্কের মাপকাঠিতে। আর এই বিচারে বহু মুসলমান শাসকের শাসনব্যবস্থা তথা কার্যকলাপ নির্দ্বিধায় নিন্দনীয়। হিন্দু রাজাদেরও সমস্ত কীর্তিকলাপ আর নীতিকে কি সমর্থন করা যায়? রাজা-প্রজার সম্পর্কের বিষয়টি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই বুঝতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে এই বোধ উন্মেষিত করার দায়িত্ব প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের।

ধর্মীয় বলয়ের বাইরে এদেশের মুসলমানদের বড়ো একটা আন্দোলন করতে দেখা যায় না

শুধু অতীত ইতিহাসের ক্ষেত্রে নয়, বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও মুসলমান জনসাধারণের প্রতি-ক্রিয়া সম্বন্ধে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। সামাজিক অনগ্রসরতা বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে সাধারণভাবে এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় বলয়ের বাইরে বড়ো একটা আন্দোলন করতে বা উত্তেজিত হতে দেখা যায় না। পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলির রাজনীতি তাঁদের যেভাবে প্রভাবিত করে বা মুসলিম দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী তাঁদের মনকে যেভাবে চঞ্চল করে, ভারতের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা ধর্মনিরপেক্ষ কোনো সমস্যা তাঁদের মনকে সেভাবে নাড়া দেয় না। এটা কোনো অভিযোগ নয়। এটা বাস্তব পরিস্থিতি যার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরা অনেকাংশে দায়ী। এটা জনগণের পশ্চাৎপদ অংশের দুর্বলতা—এ কথা মেনে নিলেও দেশের নেতারা, বিশেষ করে মুসলমান নেতারা, এ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। মুসলমান নেতাদের উচিত বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মুসলমান জন-সাধারণকে বেশি-বেশি করে শামিল করা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অবশ্য অনেক মুসলমান সদস্য

আছেন এবং বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচীতে তাঁরা যোগ-দানও করেন। কিন্তু তা তো আগেও ছিল। এতে বিশেষ কিছু হবার নয়।

মুসলিম সংগঠনগুলির উচিত ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের বাইরেও বড়-বড় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হওয়া

মুসলমান সংগঠনগুলি যদি শুধু ধর্মসংক্রান্ত বা ইসলাম-শাসিত দেশের সমস্যা নিয়েই আন্দোলন না করে সাধারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও আন্দোলন বা মিটিং মিছিল করেন, তবে সাধারণ মুসলমানদের গণতান্ত্রিক চেতনা উন্নত হবে এবং প্রসার লাভ করবে। মূল স্রোতের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা গড়ে উঠবে এবং মুসলমানদের প্রতি ভুল ধারণার অবসান ঘটবে। হিন্দু-মুসলমান সন্দেহের আবরণ ছিন্ন হবে। মুসলমানরাও বৃহত্তর পটভূমিতে প্রতিষ্ঠার মর্যাদা অর্জন করতে পারবেন। অন্যথায় শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে কোনো না কোনো হিন্দুদলের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে সংকীর্ণ পরিচয় নিয়ে, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের অমর্যাদা নিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে থাকতে হবে। শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বর্তমান ভারতে নিজেদের সংগঠিত করতে গেলে মুসলমান নেতারা সাধারণ মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাবেন।

আজ আর কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই

একটা বিষয় ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের আর স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাধীনতার আগে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ছিল চতুর ইংরেজের হাতে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও হিন্দু এবং কখনও মুসলমানকে সাহায্য করে ইংরেজ তার স্বার্থসিদ্ধি করত। কিন্তু বর্তমান ভারতরাষ্ট্র আছে হিন্দু জননায়কদের হাতে। হিন্দুদের সঙ্গে বৈর সম্পর্কের জন্য স্বাধীনতার আগে মুসলমানরা ইংরেজদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করত। আজ সেই রাষ্ট্র কোনো তৃতীয় শক্তির হাতে নেই। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতি না ঘটলে মুসলমানদের পক্ষে আজ রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নভাবের জন্ম হচ্ছে এবং ভোট-ব্যাঙ্ক হিসাবে একটা চাপসৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের ভূমিকা পালন করে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

ধর্ম বা 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে। মুসলমান নেতাদের দাবিতেই সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তান। এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলবাদী মুসলমান নেতারা যদি 'ইস্‌লামের বিপন্নতার' ধ্বনি তুলে মুসলমান সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে চান তবে তাঁরা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানদের সংগঠিত হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে সংঘাতের পথে ঠেলে দেবেন। এর পরিণতি হিন্দু-মুসলমান কারো পথেই সুখকর হতে পারে না।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা এটাই চান যে মুসলমানরা ধর্মীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হোন

স্বাধীনতার পূর্বে যে ভিত্তির ওপর মুসলমানরা দাঁড়িয়ে ছিলেন আজ সেই ভিত্তি নেই। সুতরাং স্বাধীনতার পূর্বে তাঁরা যেভাবে সংগঠিত হয়েছিলেন আজ সেই-ভাবে তাঁদের সংগঠিত হলে চলবে না। সংগঠনের পদ্ধতি ও কৌশল পালটাতে হবে। কিন্তু রক্ষণশীল ও অক্ষম মুসলমান নেতারা এই সত্যকে বুঝতে পারছেন না। এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসতে হবে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানদের। মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে পৃথক করতে হবে, অথবা ধর্মীয় নেতৃত্বকে আধুনিক-মনস্কতা অর্জন করতে হবে। হিন্দু-মৌলবাদীরা বা সাম্প্রদায়িক নেতারা এটাই চান যে মুসলমানরা

ধর্মীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে অস্থির হয়ে উঠুক। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক পরিবেশ এর ফলে হয়ে উঠবে উত্তপ্ত এবং হিন্দু রাজনৈতিক দলগুলি হবে আরও সংহত ও পরিপুষ্ট। এই চক্রান্ত ছিন্ন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমস্ত রকম মৌলবাদীদের কাছ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা। মৌলবাদী ধর্ম-গুরুদের রাজনীতির প্রাঙ্গণ থেকে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলে ভারতের ভবিষ্যৎ হবে সংকটময়। এই সত্যকে আজ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষদের মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করবার সময় হয়েছে। এই উপলব্ধি না জন্মালে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' কাঠামো হয়তো বজায় থাকবে কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারত থাকবে না।

সূত্র-নির্দেশিকা :

১. Prelude to Partition—The Indian Muslims & the Imperial System of Control—1920-1932, David Page, Chap 2 (Oxford)

২. এবং ২(ক) The Comrade, 9 January 1925 উদ্ধৃতি—Gandhi—A Challenge to Communalism—A Study of Gandhi and the Hindu Muslim Problem, 1919-1929 p 201 (New Delhi)—Gargi Chakrovartty

৩. Autobiography—Nehru, p 139

৪. প্রাগুক্ত, p 139

৫. The Musalman, 21 January, 1927

৬. উদ্ধৃতি—A Challenge to Communalism—Gargi Chakrovortty

৭. ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও মুসলিম অবদান—শান্তিময় রায় (মুক্তধারা), পৃ ৮১

৮. Autobiography—Nehru, p 137

৯. পরিচয় ১৩১৮, রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড—পৃ ৬০৫, বিশ্বভারতী (১৩৭৬)

১০. Bal Gangadhar Tilak—A Study in Stereotypes—A. B. Shah, Quest July August, 1971

অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায় : ১৯৩৭—১৯৪৭

সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৬)

ফজলুল হকের পদত্যাগের পর গভর্নর সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা তৈরি না করে, লীগ নেতা নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিসভা তৈরির জন্য ডেকে পাঠান। শেষ পর্যন্ত জিন্নার আশা পূর্ণ হয়। ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল ৭ জন মুসলমান বিধায়ক, ৩ জন বর্ণ হিন্দু বিধায়ক ও ৩ জন তফসিলি বিধায়ককে নিয়ে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভাকে অভাবনীয় দুটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমটি হল, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, যার বিবরণ আমরা পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অশনিসংকেত" উপন্যাসে। আর দ্বিতীয়টি হল, কাপড় আর সুতিবস্ত্রের অভাব। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃতের সংখ্যাকে সম্ভবত ছাড়িয়ে যায়। হাজার-হাজার মানুষ খাবারের অভাবে তিল-তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।[৫৭] সরকার-গঠিত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন মনে করেন যে, এই দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন : 'In fact, it can be shown that the commission's own method of calculation does lead to a figure around three million deaths.'[৫৮] এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙলার গ্রাম্য-জীবন আর অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। পুরোনো মূল্যবোধের পরিবর্তন এই সময় থেকেই শুরু হয়। এই দুর্ভিক্ষ বাঙলার আর বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে।

এই দুর্ভিক্ষের অনেক কারণ ছিল। শুধুমাত্র নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা ঠিক নয়। তবে একথা সত্যি যে, শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতার জন্য মানুষের দুর্দশা বেড়ে গিয়েছিল। বাঙলাদেশের অস্থায়ী গভর্নর রাদারফোর্ড নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য রেশন দোকানের মালিকেরা বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস চোরাকারবারিদের বেশি দামে বিক্রি করে দিয়েছিল। শহরে ও গ্রামে অসৎ, অসাধু সরকারি অফিসারেরা ন্যায্য বন্টনের সরকারি নীতির বিরোধিতা করেছিল।[৫৯] দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন দুর্ভিক্ষনিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যর্থতার জন্য নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করেন। বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক এবং অন্যান্য বিধায়করাও দুর্ভিক্ষনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করেন। অসামরিক সরবরাহ (সিভিল সাপ্লাই) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সোহ্‌রাবর্দি ছিলেন আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইসপাহানি জিন্নাকে কলকাতায় আসার জন্য অনুরোধ করেন। জিন্না দিল্লীতে লীগের সভায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার প্রশংসা করে 'a fire brigade called too late to put out the raging famine' বলে অভিনন্দিত করেন।[৬০]

মন্ত্রিসভার শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতার কারণে বাঙলাদেশে সুতিবস্ত্রের এক ভয়াবহ অভাব সৃষ্টি হয়। এই এই সময় গ্রামবাঙলায় একটি ধুতি বা শাড়ি সংসারের সকলে ব্যবহার করত। অন্য সময়ে লজ্জানিবারণের উপায় না থাকায়, সাংসারিক ও অন্যান্য কাজকর্ম রাত্রিবেলা করতে হত। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সমর্থক ইউরোপীয়ান দলের সদস্যরাও সরকারের সমালোচনা শুরু করেন। বিধানসভায় এই দলের নেতা এইচ. আর. নর্টন মন্ত্রিসভার সমালোচনা করে বলেন, 'As a businessman of 36 years' experience in Calcutta, I have never known such a dearth of cloth as there has been during the last 12 months.'[৬১] ভাইসরয় ওয়াভেল মন্ত্রিসভার ব্যর্থতার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। লনডনে ওয়র কেবিনেটেও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ব্যর্থতার কারণে এই মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দিলে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে—এ নিয়েও ওয়র কেবিনেটে আলোচনা হয়।[৬২] বাঙলার গভর্নর কেসী ভাইসরয় ওয়াভেলকে সংবিধানের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করে বাঙলার শাসনব্যবস্থা বাতিল করার জন্য অনুরোধও করেছিলেন।[৬৩]

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান দাবি করা হয়। এই দাবিকে জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত করার ব্যাপারে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই সময় আবুল হাশেম বাঙলায় মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। পাকিস্তান দাবিকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি গ্রামবাঙলায় জনসংযোগ ও প্রচার অভিযান আরম্ভ করেন। ফলে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে লীগের শাখা আর সদস্যসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। লীগ পাকিস্তান দাবি করলেও, পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখা সম্পর্কে লীগ-নেতাদের কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তা সত্ত্বেও লীগ প্রচার-অভিযান অব্যাহত রাখে। এই প্রচার-অভিযানের ফলেই ১৯৪৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে লীগ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনে সুভাষ বোস-পন্থী কংগ্রেস পায় ১৭টি আসন, হিন্দুমহাসভা ১১টি, মুসলিম লীগ ১৭টি, মুসলিম মজলিশ দল পায় ২টি আসন, মুসলিম স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পান ৩টি আসন, অ্যাংলো-ইনডিয়ানরা পায় ২টি আসন এবং সংরক্ষিত আসন বা নির্বাচনকেন্দ্রগুলিতে মুসলমান প্রার্থীরা ১২টি আসন পায়। অলডারম্যান নির্বাচনে, সমস্ত মুসলমান প্রার্থীরাই বিজয়ী হন।[৬৪]

১৯৪০ সালে প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রণয়নের চেষ্টা করেছিল, নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা সেই বিলটিরই কিছু পরিবর্তন করে বিধানসভায় পেশ করেন। হিন্দু সদস্যরা এই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। অতুলচন্দ্র কুমার এই মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে পরিষদীয় সচিব নিযুক্ত হন। তিনি এই বিলটি পেশ করার ব্যাপারে বিরোধিতা করেন। তা

সত্ত্বেও বিলটি বিধানসভায় পেশ করা হলে প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন। এই প্রস্তাবিত বিলটির বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রায় তিন হাজার সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়।[৬৫] ভারতবর্ষে আর কোনো বিলের বিরুদ্ধে সম্ভবত এত সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয় নি। এইভাবে মন্ত্রিসভা মুসলমানদের মধ্যে লীগের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সচেষ্ট হয়। লীগের নূতন সম্পাদক আবুল হাশেম আর নাজিমুদ্দিনের প্রভাবে লীগ ক্রমশ জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। লীগের সদস্যসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। নীচের তালিকা থেকে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

জেলার নাম	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	সদস্যসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ—জেলাপুলিশ-প্রধানের মন্তব্য।
বাখরগঞ্জ	২০,০০০	২০,০০০	৩,৫০,০০০	
বাঁকুড়া	১৫০	১৬০	১৫০০	
বর্ধমান	২০৫৫	২৫০০	৩০,০০০	
বগুড়া	১৯৩০	১২,৪৩০	১৩,৭০০	
বীরভূম	১০,০০০	১২,০০০	১৪,০০০	
চট্টগ্রাম	৬,০০০	৪০,০০০	৬০,০০০	
দিনাজপুর	২০,০০০	২১,০০০	২৬,০০০	জেলাপুলিশ প্রধানের মতে লীগের প্রচারের ফলেই এত সদস্যসংখ্যা বেড়েছে।
ফরিদপুর	২০,০০০	৬০,০০০	১,০০,০০০	মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে লীগের উপর আস্থা বাড়ার জন্যই এই অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি।
হুগলী	৪১	১৬৭৫	৬৬৭৭	
হাওড়া	২,০০০	৫০০	২০,০০০	
জলপাইগুড়ি	৩১২	২৩০০	৬৯৬৬	লীগের নির্বাচনী প্রচার ও অন্যান্য প্রচারের ফলে এই অস্বাভাবিক সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
যশোর	১৮৬২	১৮৬২	৬৫৭০	লীগের সদস্যসংখ্যাবৃদ্ধি প্রচার-অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল।
খুলনা	৫০০০	৮০০০	৭০,০০০	লীগের প্রচার-অভিযানের ফল।
মালদা	৯০,০০০	৯০,০০০	৮৭৫০	
মেদিনীপুর	১১৯৩	২৮৪৬	৪৩১৪	
ময়মনসিংহ	৪৫,৫১৭	৫৮,৯২৫	১,৫০,০০	
মুর্শিদাবাদ	৪০০০	৮০০০	২৫,০০০	
নদীয়া	২০২২	২০৪৫	১,৫০,০২৭	
নোয়াখালি	৫০,০০০	৫,০০০	৮৫,০০০	
পাবনা	৬১৭৮	৯৫৭৩	১২,৪৯৯	লীগের নির্বাচনী প্রচারের ফলে সদস্য সংখ্যা বেড়েছে।
২৪ পরগনা	৩০০০	৩১০০	১০,৬৯৯	
রাজশাহী	৫৯৭৭	৫৭৮০	৩০,৫০০	কাগজ-কলমে হিসেব। প্রকৃত সংখ্যা এত নাও হতে পারে।
রংপুর	৩৭,০৭৮	৪১,৪০৯	৭৫,২০৯	লীগ এখানে ধীরে-ধীরে সংগঠিত হয়ে প্রচার ও নির্বাচনী অভিযান শুরু করায় এই সংখ্যা বেড়েছে।
ত্রিপুরা	৩৯,০০০	৪৫,০০০	২৫,০০০	
কলকাতা	—	—	৫০,০০০	

(আই. বি. রিপোর্টের ভিত্তিতে লেখক তৈরি করেছেন)

বাঙলায় ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতা রোধ করার জন্য কংগ্রেস নেতা কিরণশংকর রায় ১৯৪৪ সালের ২১শে মার্চ নাজিমুদ্দিনকে লীগ-কংগ্রেস যৌথ মন্ত্রিসভা গঠনের এক প্রস্তাব দেন। গভর্নর কেসীর সঙ্গে নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাবের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। অনেক সদস্য বিরোধী দলে যোগ দেয়। অবস্থা খুবই অনিশ্চিত হয়ে ওঠায় নাজিমুদ্দিন শঙ্কিত আর চিন্তিত হন। ভারতসচিব ওয়র কেবিনেটে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করে অভিমত দেন যে, এই অনিশ্চিত অবস্থায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।[৬৬] মন্ত্রিসভার এই অবস্থায় বিরোধীরা একজোট হয়ে মন্ত্রী বি. পি. পাইন, টি. এন. মুখোপাধ্যায় ও সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। বি পি. পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি দীর্ঘ ছ ঘণ্টা আলোচনার পর ১১৯-১০৬ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। ইউরোপীয় সদস্যদের ভোটে মন্ত্রিসভা টিঁকে যায়। এই অবস্থায় টি. এন. মুখোপাধ্যায় ও সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি আলোচিত হবার আগেই গভর্নর হঠাৎ বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে বিরোধীরা প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ নেতা ফজলুল হকের নেতৃত্বে একজোট হন। ফলে মন্ত্রিসভার বিপদ বেড়ে যায়। ভারতসচিব আমেরি ও ভাইসরয় ওয়াভেলের চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, ওয়াভেলও এই মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। তিনি জানতে পারেন যে, নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারে নি।[৬৭] গভর্নর কেসী বুঝতে পারেন যে, যদি এই মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়, তবে ফজলুল হক ও ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যৌথভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করবেন। বিধানসভায় ইউরোপীয় দলের সদস্যরাও এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে পারে আঁচ করে গভর্নরকে জানিয়ে দেন যে, ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদের যৌথ কোনো মন্ত্রিসভা যদি গঠিত হয়, তাঁরা কোনরকমভাবে এদের সমর্থন করবেন না।[৬৮]

এইরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরতির পর বিধান-সভায় বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বিরোধীরা যে-কোনো সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। মন্ত্রী সৈয়দ মুয়াজ্জেমউদ্দিন কৃষি-বাজেট পেশ করেন। বিরোধীরা এই বাজেটকে অগ্রাহ্য করেন। প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। কৃষি-প্রস্তাবটি ১০৬-৯৭ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। শাসকদলের অনেক বিধায়ক

বিরোধীদের ভোট দেন। স্পীকার নৌশের আলি রুলিং দিয়ে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর এই প্রথম কোনো মন্ত্রিসভা সরাসরি ভোটে পরাস্ত হল।[৬৯] বিরোধীরা স্পীকারের এই রুলিংকে ঐতিহাসিক বলে অভিনন্দিত করেন।

মন্ত্রিসভা ভোটে পরাস্ত হওয়ার পর, নাজিমুদ্দিন জিন্নাকে ৩১শে মার্চ একটি চিঠিতে কিভাবে মন্ত্রিসভা পরাস্ত হয়, তার বিবরণ জানিয়ে অভিযোগ করেন,

'The corupt elements amongst M. L. As were all bought over in a couple of nights and locked up in a house and taken to the Assembly to register their votes. They were paid large sums of money provided mainly by the Marwaris and Hindu Mahasabha. Our action against the hoarders and profiteers of cloth brought them out in the open and they thought that if by spending money they could have their nominees into the cabinet, they will have an easy time. All investment of a few lakhs was nothing to born speculators when the prospect of return was tenfold. Inspite of this, we had a very small majority, but the Speaker's ruling.....has forced Section 93."[৭০]

গভর্নর শাসনক্ষমতা হাতে নিলেও, মন্ত্রীদের পদত্যাগ করার কোনো নির্দেশ না দেওয়ায়, নাজিমুদ্দিন তাই আশাবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি জিন্নার কাছে কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি চান।[৭১] জিন্না সম্মানজনক শর্তে নাজিমুদ্দিনকে কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার কোনো সুযোগই নাজিমুদ্দিন পান নি।

১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন ও সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভা

নাসিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা বাতিলের পর, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। বাঙলায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং কৃষক-প্রজা পার্টি ছিল প্রভাবশালী। লীগের প্রাধান্যকে খর্ব করার জন্য জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে যুক্তভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। জিন্না নির্বাচনে 'মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি' প্রমাণ করার জন্য মুসলমানদের মুসলমান প্রার্থীদেরই শুধুমাত্র ভোট দেবার জন্য নির্দেশ দেন।[৭২] আবুল হাশেম 'Let Us Go to War' লিফলেটে লীগের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। তিনি দ্বিধা-হীন ভাবে ঘোষণা করেন—

'The general election is the beginning of our struggle. Immediately after recording our votes in favour of Pakistan at the polling centres, immediately after winning our plebiscite liquidating the false claims of the Congress to represent the Muslims, we shall direct our attention towards British imperialism and demand immediate transference of power to the peoples of India on the basis of Pakistan.....'

লীগনেতারা বিভিন্ন জেলাগুলিতে নির্বাচনী প্রচারে মুসলমানদের পাকিস্তান আদায়ে শামিল হওয়ার জন্য ডাক দেন। জিন্না আগেই ঘোষণা করেন যে, এই নির্বাচন হল 'a piebiscite of the Muslims of India on Pakistan.' এই অবস্থায় লীগ সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। মুসলমান ছাত্রসংগঠনগুলিও এই নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষ শুরু হয়। পূর্ববাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে অ-লীগপন্থী মুসলমান প্রার্থীদের উপর হামলা শুরু হয়। বাখরগঞ্জ জেলার সাহেবগঞ্জ থেকে ফজলুল হক এক তারবার্তায় অভিযোগ করেন যে, লীগপন্থীরা জোরজুলুম আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব করে তুলতে সচেষ্ট।[৭৩] এ ছাড়া মাদারিপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে লীগপন্থীরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বলে কলকাতায় খবর আসে। টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার সময় লীগ-সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত হন।[৭৪] সিরাজগঞ্জ নির্বাচনীকেন্দ্রের কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থী মৌলভী বরাট আলিকে লীগ সমর্থকরা জোর করে আটকে রাখে। শেষে তিনি লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হন যে, তিনি লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এই শর্তে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।[৭৫] মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী হন জনৈক আবদুল গনি চৌধুরী। লীগ-সমর্থকরা বানারীগ্রামে আবদুল গনি চৌধুরীর বাড়িতে হামলা করে প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে।[৭৬] পূর্বতন বিধানসভার স্পীকার নৌশের আলি, কৃষক-প্রজা পার্টির সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমী, আজাহার আলি ও অন্যান্য অনেকে লীগ-সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব নির্বাচনীকেন্দ্রের অ-লীগপন্থী প্রার্থী এইচ. আর. চৌধুরী ও ময়মনসিংহ নির্বাচনকেন্দ্রের অ-লীগপন্থী প্রার্থী কাশেম আলিকে লীগ-সমর্থকরা প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের জন্য তাদের নিজের-নিজের বাড়ির মধ্যেই আটকে রাখে। মাদারিপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সুফী জনাব আলির প্রচারপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র স্টীমারে মাদারিপুরে পৌঁছুলে, লীগ-সমর্থকরা সব কাগজপত্র পুড়িয়ে দেয়। লীগের সমর্থকদের এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শকের।[৭৭] সরকারের পাক্ষিক প্রতি-বেদন থেকে জানা যায় যে, সরকারি কর্তৃপক্ষও নির্বাচনের আগে লীগ ও প্রধান বিরোধী দলের সমর্থকদের মধ্যে পূর্ববাঙলার কয়েকটি অঞ্চলে গুরুতর সংঘর্ষের আশঙ্কা করেছিলেন।[৭৮] নির্বাচনী প্রচারে লীগনেতারা পীর ও মোল্লাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই মৌলবাদীরা পরলোকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে সহজ, সরল, অর্ধশিক্ষিত মুসলমানদের লীগ-প্রার্থীদের ভোট দিতে নির্দেশ দেয়।[৭৯] মুসলমান-দের উদ্দেশ্য করে লাহোরের জামা আলমগীর মসজিদের ইমাম গোলাম মুর্শেদ লাহোরী বলেন, 'This election battle is the first battle of achieving Pakistan. Our future depends on victory in the election.'[৮০] এই নির্বাচনী ফলাফলের উপর লীগের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। তাই লীগ-নেতারা "মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান" শ্লোগানটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। ফলে কংগ্রেসের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিগুলি লীগের পাকিস্তান-হাওয়ার কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়।[৮১]

এই নির্বাচনে লীগের বিরাট সাফল্য দেখা যায়। লীগ মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ১১৫টিতে এবং কংগ্রেস ৮৭টি আসনে জয়ী হয়। কৃষক-প্রজা পার্টি, কমিউনিস্ট দল ও ইউরোপীয় দল যথাক্রমে ৪টি, ৩টি ও ২৮টি আসনে বিজয়ী হয়। নৌশের আলি কংগ্রেস টিকিটে ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটিতেই পরাস্ত হন। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা জালালউদ্দিন হাশেমী এবং রতনপুরের জমিদার কে. জি. এম. ফারুকীও এই নির্বাচনে পরাজিত হন। অ-লীগপন্থী মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র ফজলুল হক ২টি আসনে জেতেন। এই নির্বাচনী ফলাফল থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়, যথা (১) লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি, জিন্নার এই দাবি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং (২) লীগের পাকিস্তান দাবির প্রতি ভারতীয় মুসলমান-দের পূর্ণ সমর্থন আছে, এই সত্যও নির্বাচনের রায়ে

সত্য বলে প্রমাণিত হয়।[৮২]

এই নির্বাচনের আগে খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সোহরাবর্দির সংগঠনগত কারণে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। স্বাভাবিকভাবেই সোহরাবর্দি বিধানসভায় লীগের নেতা নির্বাচিত হন। গভর্নর তাঁকে মন্ত্রিসভা তৈরির জন্য আমন্ত্রণ করেন। বাঙলায় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উন্নতির স্বার্থে কংগ্রেস লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়। লীগের কনভেনশনে যোগ দিতে সোহরাবর্দি দিল্লী আসেন। এই সময় তিনি নূতন মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের যোগ দেওয়ার বিষয় নিয়ে আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আজাদ মন্ত্রিসভায় যে-কোনো কংগ্রেস সদস্যকে নেওয়ার উপর জোর দেন। কিন্তু জিন্না মন্ত্রিসভায় কোনো অ-লীগপন্থী মুসলমানকে গ্রহণে মত দেবেন না, এই যুক্তি দেখিয়ে সোহরাবর্দি আজাদের প্রস্তাব বাতিল করেন। আসলে, আজাদ ফজলুল হককে স্পীকার নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন বলেই সোহরাবর্দি আজাদের প্রস্তাব বাতিল করে দেন।[৮৩] কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইবার এই প্রস্তাবগুলি দেওয়া হয়।

(১) সোহরাবর্দি হিন্দুদের প্রতি লীগের ও তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দেবেন।

(২) যৌথভাবে গঠিত মন্ত্রিসভায় সাফল্যের জন্য, দুই দলের অনুমতি ছাড়া কোনো সাম্প্রদায়িক আইনের প্রস্তাব বা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব বিধানসভায় করা যাবে না।

(৩) মন্ত্রিসভায় আনুপাতিক হারে লীগ আর কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা হবে ৫০ : ৫০। এ ছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন লীগ থেকে।

(৪) এই শর্তগুলিতে যদি লীগ রাজি হয়, তবেই মন্ত্রিসভায় দপ্তর বন্টন নিয়ে কংগ্রেস আলোচনায় বসবে।

(৫) সমস্ত ধরনের রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।[৮৪] মন্ত্রিসভায় দুই দলের মন্ত্রীদের সংখ্যা একই হবে এবং মুখ্যমন্ত্রী লীগ থেকে নির্বাচিত হবেন বলে কংগ্রেস স্বরাষ্ট্র অথবা অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হাতে রাখবে। এই প্রস্তাব সোহরাবর্দি বাতিল করে পালটা প্রস্তাব দেন যে, মন্ত্রিসভায় ৭ জন লীগমন্ত্রী এবং ৫ জন কংগ্রেস মন্ত্রী থাকবেন আর মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হবেন।[৮৫] সোহরাবর্দির এই পালটা প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করতে না পারায় লীগের সঙ্গে যৌথভাবে মন্ত্রিসভা গড়ার সুযোগ ব্যর্থ হয়। সোহরাবর্দির নেতৃত্বে বাঙলায় লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভায় একমাত্র হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

বাঙলায় নির্বাচন শেষ হওয়ার আগেই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস, পেথিক লরেন্স এবং এ. ভি. আলেকজানডারকে ভারতে পাঠান। এই কমিশনের দলনেতা ক্রিপসের নামে ক্রিপস মিশন নামে পরিচিত। মিশন ১৯৪২ সালের মার্চে দিল্লীতে উপস্থিত হয়। মি ন কংগ্রেস আর লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছাড়াও প্রাদেশিক নেতা, যেমন কিরণশংকর রায়, সোহরাবর্দি, ফজলুল হক, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আলোচনা করেন। মিশন জিন্নার পাকিস্তান দাবিকে বিভিন্ন যুক্তিতে খারিজ করে দেন।[৮৬] অবশেষে ৩০শে মার্চ মিশন একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (ফেডারাল গভর্নমেনট) গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক দপ্তর, প্রতিরক্ষাবিভাগ এবং যোগাযোগদপ্তর পরিচালনা করবেন। প্রাদেশিক সরকারগুলি অন্য সব ক্ষমতা ভোগ করবে। ক্রিপস মিশন তাই ভারতীয় রাজ্যগুলিকে তিনটি দল বা গ্রুপে ভাগ করেন। যথা : (এ) মাদ্রাজ, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যা। (বি) পানজাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান। (সি) বাঙলা এবং আসাম। এই প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে পারবে এবং এইরকম কয়েকটি প্রদেশ ইচ্ছানুযায়ী স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রও গঠন করতে পারবে। ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা তৈরি করতে হবে। সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তিকালীন সরকার শাসন পরিচালনা করবে।

লীগ ক্রিপস মিশনের এই প্রস্তাব মেনে নেয়। কংগ্রেস অন্তর্বর্তিকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবে রাজি না হলেও, সংবিধানসভায় যোগ দিতে রাজি হয়। জিন্না এই সরকার গঠনের জন্য ভাইসরয় ওয়াভেলকে অনুরোধ করেন, কিন্তু কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র লীগকে নিয়ে এই সরকার গঠনে ওয়াভেল অরাজি হন। এদিকে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে মতান্তর শুরু হয়। ফলে লীগ ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলি থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। অন্যদিকে কংগ্রেসের দাবি স্বীকৃত না হওয়ায়, কংগ্রেস নেতারা "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ডাক দেন। ওয়াভেল এই সময় অন্তর্বর্তিকালীন সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করেন। কংগ্রেস সভাপতি নেহরু এই প্রস্তাবে রাজি হন এবং লীগকে এই সরকারে ১৪টির মধ্যে ৫টি আসন গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান। জিন্না এই সরকারে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো মুসলমান সদস্যকে নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করে সরে দাঁড়ান। এই অবস্থায় লীগকে বাদ দিয়েই কংগ্রেস অন্তর্বর্তিকালীন সরকার গঠনে প্রস্তুত হয়।

এই সময়ে বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাবর্দি সংবাদ-সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে নূতন দিল্লীতে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। লীগকে বাদ দিয়ে অন্তর্বর্তিকালীন সরকার গঠনের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি বলেন,

We will see that no revenue is derived by such Central Government from Bengal and consider ourselves as a separate state having no connection with the centre.[৮৭]

এই অবস্থায় বিক্ষুব্ধ জিন্না লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ২৯শে জুলাইয়ের সভায় সারা ভারতবর্ষে ১৬ই অগস্ট "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" পালনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেন।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকৎ আলি খাঁ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে বলেন,

Direct Action means resorting to non'-constitutional methods and that can take any form and whatever form may suit the conditions under which we live. There are only two ways of-resisting a Government—by constitutional means and by Direct Action. We will resist it by any means and will make the founctioning of such a Government impossible.[৮৮]

ইউনাইটেড প্রেসের তরফে খাজা নাজিমুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ডাইরেকট অ্যাকশন বলতে তিনি কী বোঝেন। নাজিমুদ্দিন ব্যাখ্যা করে বলেন,

There are hundred and one ways in which we can create difficulties, specially when we are not restricted to non-violence. The Muslim population of Bengal know very well what 'Direct Action' would mean and so we need not bother to give them any lead.[৮৯]

কিভাবে এ দিনটি পালন করা হবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দেন যে, এইদিন সারাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখানো হবে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য জিন্নার ভাষা থেকে বোঝা যায়। লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ

হওয়ার পর জিন্না বলেন,

What we have done today is the most historic act in our history. Never have we in the whole history of the League done anything except by constitutional methods and by constitutionalism. But not we are obliged and forced into this position This day we bid goodbye to constitutional methods.[২০]

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের জন্য সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভা ১৬ই অগস্ট সরকারিভাবে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেন।[২১] তিনি ঘোষণা করেন যে, এইদিন লীগ-সমর্থকরা হিন্দুদের কোনো কাজে কোনোরকম বাধা দেবে না। তবু গুজব ছড়াই যে, ১৬ই অগস্ট বাঙলায় পূর্ণ হরতাল পালিত হবে। ময়দানের জনসভায় নাজিমুদ্দিন, গজনফর এবং সোহরাবর্দি বক্তৃতা দেন। জনৈক বক্তা মন্তব্য করেন,

Pakistan would have to be established by breaking the walls of Fort William[২২]

১৬ই অগস্ট সকাল ৬টার সময়ে শ্যামবাজারের কাছে প্রথম হাঙ্গামা শুরু হয়। লীগ-সমর্থকরা হাতিবাগান বাজারে হিন্দুদের দোকান জোর করে বন্ধ করতে চাইলে গোলমাল আরম্ভ হয়।[২৩] বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দাঙ্গা শহরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু মুসলমান—দুই সম্প্রদায়ের লোকেরাই হত্যা, লুঠ ও আগুন লাগাতে শুরু করে। তিনদিন ধরে এই দাঙ্গা চলে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায়, সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়। ১৬ই এবং ১৭ই অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী সোহরাবর্দি, মুখ্যসচিব মি. ওয়াকার ও অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব লালবাজার পুলিশ কনট্রোল রুমে উপস্থিত থেকে কলকাতার দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করেন। সোহরাবর্দির কনট্রোল রুমে উপস্থিতি ভাইসরয় ওয়াভেলের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তিনি ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লেখেন,

The chief points to my minds were Suhrawardy's continual presence in the Control Room on the first-day with many Muslim friends and his obvious communal bias...[২৪]

এই অভূতপূর্ব দাঙ্গার কারণে ১৬ই থেকে ২৮শে অগস্ট পর্যন্ত কলকাতার কারমাইকেল হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ক্যাম্‌বেল হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল, ইসলমিয়া হাসপাতাল, লেক হাসপাতাল, মেয়ো হাসপাতাল, হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল এবং আলিপুরের সামরিক হাসপাতাল দাঙ্গায় আহতদের চিকিৎসার জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয়। হাসপাতালগুলির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এই কয়েক দিনে ২,৩২২ জন হিন্দু, ১৮৩২ জন মুসলমান এবং ২২২ জন অন্যধর্মাবলম্বীকে আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়। মৃত অবস্থায় আনা হয় ১১ জন হিন্দু, ১২ জন মুসলমান ও ১১ জন অন্যধর্মীয় লোককে। ১৫১ জন হিন্দু, ১৫৮ জন মুসলমান এবং ৬২ জন অন্যধর্মীয় লোক হাসপাতালে মারা যায়।[২৫] এই দাঙ্গায় ঠিক কতজন লোক নিহত হয়, তার সঠিক হিসেব দেওয়া কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তবে সরকারি প্রতিবেদন থেকে মনে হয় যে, প্রায় ৪,০০০ লোক নিহত হয়, আর ১০,০০০ লোক কোনো না কোনোভাবে আহতহয়।[২৬] এর মধ্যে দুই সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। দাঙ্গার ফলে জোড়াসাঁকো তালতলা, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, বউবাজার ও মানিকতলা অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দাঙ্গা-কবলিত অঞ্চল থেকে বহু লোককে নিরাপদ জায়গায় এবং সরকারি আশ্রয়শিবিরে সরিয়ে আনা হয়। সরকারি প্রতিবেদন অনুসারে মধ্য, উত্তর, দক্ষিণ কলকাতা থেকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয় যথাক্রমে ৫,৯৬৯, ১১, ৭৫১ আর ৬,৩৮০ জনকে।[২৭]

১৬ই অগস্টের এই দাঙ্গার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, দুই সম্প্রদায়েরই নীচুতলার লোকেরা

যেমন, দোকানদার, রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, গোয়ালা, দারোয়ান শ্রেণীর লোকেরাই নিহত বা আহত হয়।[২৮] তুলনামূলকভাবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের সম্পত্তি, বাড়িঘর নষ্ট হলেও, প্রাণহানির সংখ্যা ছিল কম। ফায়ার ব্রিগেডের প্রতিবেদন থেকে এই দাঙ্গায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির একটি মোটামুটি হিসেবে পাওয়া যায়। (১) হিন্দু মালিকানা—ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাব্য পরিমাণ ৬৫ শতাংশ, (২) মুসলমান মালিকানা—ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য পরিমাণ ২০ শতাংশ, (৩) হিন্দুমুসলমান যৌথ মালিকানা ১৫ শতাংশ অজ্ঞাত ইউরোপীয় মালিকানা সরকারী মালিকানা—ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য পরিমাণ ১৫ শতাংশ।[২৯]

এই দাঙ্গার জন্য লীগ নেতৃত্ব কতখানি দায়ী ছিলেন? এ প্রসঙ্গে আমরা লীগ-নেতাদের পরোক্ষ ভাবে দায়ী করতে পারি। ১৬ই অগস্টের আগে বিভিন্ন বক্তৃতায় লিয়াকৎ আলি খাঁ, নাজিমুদ্দিন আর সোহরাবর্দির অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বাঙলার লীগ সভাপতি মৌলানা আকরম খাঁ মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, পবিত্র রমজান মাসে কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু হবে। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, The struggle for Pakistan has begun. Our resolution of 'Direct Action' will soon be translated into action.[৩০০] কলকাতা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক ওসমান উর্‌দু প্রচারপত্র বিলি করে মুসলমানদের হিংসার পথে যেতে উশকানি দেন।[৩০১] এ ছাড়া লীগের মুখপত্র "আজাদ" পত্রিকার ১৫ই অগস্টের সম্পাদকীয়তে ১৬ই অগস্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, এ দিন থেকেই পাকিস্তান আদায়ের সংগ্রাম শুরু হবে।[৩০২] ১০ই অগস্ট করাচীতে লীগের অন্যতম নেতা গজদার ঘোষণা করেন যে, লীগের উদ্দেশ্য হল ভারতের শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া। তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-ভাবে বলেন যে, এই সংগ্রাম সম্ভবত গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে।[৩০৩] এর ফলে ১৬ই অগস্টের আগেই হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্নরকম আশঙ্কা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, পুলিশ কমিশনার ১৫ই অগস্ট রাতে সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন।[৩০৪] কিন্তু হিন্দুদের রক্ষার জন্য বা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট আদেশ বা নির্দেশ দেন নি। যদিও পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল যে ১৬ই অগস্ট ব্যাপকভাবে গণ্ডগোল হতে পারে। আই. বি. বিভাগ গোপন খবর পায় যে, (১) যদি হিন্দুরা হরতাল পালন না করে, তবে মুসলমানদের মধ্যে গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকেরা গণ্ডগোল বাধাতে চেষ্টা করবে এবং (২) বিভিন্ন মুসলমান ছাত্রাবাসগুলিতে ১৬ই অগস্ট চলাচলকারী ট্রাম ও সামরিক বাহিনীর লরিগুলিতে আগুন লাগাবার জন্য তৈরি থাকার গোপন নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩০৫] তবে কে এই নির্দেশ দেয় বা কোথা থেকে এই নির্দেশ ছাত্রা-বাসগুলিতে আসে, আই. বি. বিভাগের লোকেরা জানতে পারে নি। একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সোহরাবর্দি এ খবর জানতেন না বা তাঁকে জানানো হয় নি। তাই মনে হয় যে, পুলিশকে দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করার গোপন নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ধারণা কতকগুলি ঘটনা থেকে সত্যে পরিণত হয়। যেমন, লালবাজারের পাথরছোঁড়া দূরত্বে লিমটন ঘড়ি কোম্পানির অফিস প্রায় ২/২½ ঘণ্টা ধরে লুঠ হয়। পুলিশ লুঠেরাদের বাধা দেওয়া দূরে থাক, নিজেরাই লুঠ করতে থাকে।[৩০৬] প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা ফজলুল হক বিধানসভায় বেশ কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দেন যেখানে পুলিশ লুঠেরা-দের সঙ্গে ছিল। যখনই জনসাধারণ পুলিশের কাছে সহোয্যের আবেদন করেছে, পুলিশ জানিয়েছে যে তাদের কাছে কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ বা নির্দেশ

নেই। গভীর দুঃখে তিনি জানান যে মহিষাদল রাজবাড়ি লুঠের সময় কাছেই ট্রাফিক পুলিশদের একটি ব্যারাক ছিল। সেখানে প্রায় ১০০ জন পুলিশ কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও, কেউই এগিয়ে এসে লুঠেরাদের বাধা দেয় নি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার আরো প্রমাণ এই যে, ১৬ই অগস্ট দাঙ্গার দিনে মাত্র ২৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১০৭] ১৬ই অগস্টের ব্যাপক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। গভীর মর্মবেদনায় ফজলুল হক মন্তব্য করেন,

'I have felt that the greatest disturbances did not rise in a moment out of the moon, but seem to be a well-planned action—may be on one side or may be on both sides.'[১০৮]

সর্বশেষে, মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সোহরাবর্দি এই নৃশংস দাঙ্গার দায়িত্ব কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। ১৬ই অগস্টের আগে দিল্লী ও কলকাতায় তাঁর বক্তৃতা মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। ১৬ই অগস্টকে সরকারিভাবে ছুটির দিন ঘোষণা করায়, বিধানসভায় ইউরোপীয় দলের মি. মরগ্যান সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এই ঘোষণাকে 'unwise and a bad precedent' বলে উল্লেখ করেন। সোহরাবর্দি বিধানপরিষদে ১৬ই অগস্টকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করার কারণ দেখান, for the purpose of minimising the risks of conflicts and in the interest of peace and orders। এ থেকে বোঝা যায় যে, সোহরাবর্দি নিজেই গণ্ডগোলের আশঙ্কা করেছিলেন। সমস্ত দিক আলোচনা করে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, সোহরাবর্দি এই দাঙ্গার জন্য কোনোরকম দায়ী ছিলেন না।

কলকাতার এই দাঙ্গার ফলে হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস আরো বাড়ে, সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়। এই মন্ত্রিসভা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়, সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুরা এই 'সাম্প্রদায়িক' মন্ত্রিসভার চরিত্র সম্পর্কে আরো বেশি সন্দিহান হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে কলকাতার দাঙ্গার খবরে পূর্ববাঙলায় উত্তেজনা দেখা দেয়। ফলে কলকাতার দাঙ্গা থামতে-না-থামতেই নোয়াখালি[১০৯] ও ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। নোয়াখালি আর ত্রিপুরা অঞ্চলে লীগের জনৈক প্রাক্তন বিধায়ক গুলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে সুপরিকল্পিত উপায়ে দাঙ্গা শুরু হয়। এই দুটি জেলায় প্রায় ৩৫০টি গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়ায় প্রায় ৭০,০০০ লোক নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে।[১১০] এই দাঙ্গার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের বাড়িপোড়ানো, তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা, হিন্দু মহিলা ও মেয়েদের অপহরণ করা এবং হিন্দুমন্দিরগুলিকে অপবিত্র করা। তৎকালীন পুলিশের আই. জি. এম. টেলার নিজেই স্বীকার করেন যে, স্থানীয় পুলিশ ও জেলাশাসক এই পরিকল্পিত দাঙ্গার খবর আগেই পায়, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়। মি. টেলার একথাও স্বীকার করেন যে, অসহায় হিন্দুদের সামনে দুটি রাস্তা খোলা ছিল, (১) টাকা দিয়ে মুসলমান হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া, অথবা (২) মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া।[১১১] বাঙলার গভর্নর বারোজও নোয়াখালিতে 'গণ-ধর্মান্তরীকরণের' খবর সমর্থন করেন।[১১২] এ প্রসঙ্গে ভাইসরয় ওয়াভেল নিজে মন্তব্য করেছেন, '...were deliberately planned by the worst political elements: those in the East Bengal by a discarded supporter of Muslim League...'[১১৩]

কলকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং বিহারের দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিশ্বাস বলে আর কোনো বস্তু অবশিষ্ট ছিল না। নিজেদের রক্ষার জন্য হিন্দুরা নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের নেতৃত্বে প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলে। মুসলমানরাও আত্মরক্ষার জন্য যুবকদের সংঘবদ্ধ করে।[১১৪] হিন্দুরা লীগ মন্ত্রিসভাকে আর বিশ্বাস করতে না পারায়, মন্ত্রিসভা দ্রুত

বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। এই উত্তেজক পরিস্থিতিতে হিন্দুদের মনে আত্মবিশ্বাস ও মন্ত্রিসভার প্রতি বিশ্বাস-যোগ্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সোহরাবর্দি এখানে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। তিনি জিন্নার কাছে মন্ত্রিসভা তৈরির জন্য অনুমতি চান, কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার জন্য জিন্না সোহরাবর্দির এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন।

ক্রমবর্ধমান দাঙ্গা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব বাড়তে থাকে। হিন্দুমহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সময় প্রথম হিন্দুস্থান গঠনের পরিকল্পনা করেন। তিনি প্রচার করেন যে, লীগ পাকিস্তান আদায়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুতরাং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বাঙলার হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলি নিয়ে হিন্দুস্থান গঠন করা প্রয়োজন। হিন্দুদের মধ্যে এই ধারণা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার পাঞ্চিক প্রতিবেদনে সরকারকে জানান,

The movement was gradually gaining strength in all the districts of the divison and local Congress organisations because active in support of the movement.

যশোর, খুলনা, ২৪ পরগনার কিছু অংশে, চট্টগ্রাম এবং মালদা জেলায় হিন্দুরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে।[১১৫] দাবি আদায়ের জন্য হিন্দুমহাসভা 'জাতীয় বঙ্গ মহাসম্মেলন'-এর ব্যবস্থা করে সেই সভায় ১০,০০০ শ্রোতা ছাড়াও প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি যোগ দেয়।[১১৬] ১৯৪৭ সালের ৪-৬ই এপ্রিল হিন্দুমহাসভার বাৎসরিক সম্মেলন তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সভাপতির ভাষণে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন,

'Let us declare today that as the Muslim League persists in its fantastic idea of establishing Pakistan in Bengal, the Hindus of Bengal must constitute a separate province under a strong national Government. This is not a question of partition. This is a question of life and death for us, the Bengalee Hindus.'[১১৭]

এই সভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন,

'I conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let the two major communities residing herein live in peace and freedom.'[১১৮]

এইভাবে হিন্দুমহাসভা হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে আলাদা রাজ্যগঠনের আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আগ্রহী। এই সময়ের মধ্যে গণ-পরিষদ যদি সর্বসম্মত কোনো শাসনতন্ত্র তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, তবে ব্রিটিশ সরকার নির্দিষ্ট সময়ে কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, কোন্ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অথবা প্রাদেশিক সরকারের হাতে অথবা অন্য কোনো উপায়ে, তা বিবেচনা করে দেখবেন। এই খবরে বিচলিত প্রাদেশিক কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে বলা হয়,

'If His Majesty's Government contemplate handing over its power to the existing Government of Bengal which is determined to the formation of Bengal into a sovereign state and which by its composition is a communal Party Government, such portions of Bengal as are desirous of remaining within the Union of India, should be allowed to remain so and be formed into a separate province within the Union of India.'[১১৯]

কেন্দ্রীয় গণপরিষদে বাঙলার ১১ জন প্রতিনিধি একটি স্মারকলিপি দিয়ে ভাইসরয়কে ভারতযুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে দুটি আলাদা এবং স্বয়ংশাসিত প্রদেশ তৈরি করতে

অনুরোধ জানান। তাঁরা এই প্রস্তাবও দেন যে, অন্তর্বর্তিকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বাঙলাদেশের দুটি অংশে একজন গভর্নরের অধীনে দুটি আলাদা মন্ত্রিসভা তৈরি করে শাসনব্যবস্থা চালু করা হোক।[১২০]

সোহরাবর্দি বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করার এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ২৭শে এপ্রিল নূতন দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি মন্তব্য করেন যে, হিন্দুদের একাংশের মনে হতাশা থেকেই বাঙলা-ভাগের প্রস্তাব উঠেছে। এই প্রস্তাব আত্মহত্যার সমান। তিনি এক ঐক্যবদ্ধ, অবিভক্ত ও স্বাধীন বাঙলা গঠনের আবেদন করেন।[১২১] সাংবাদিকদের তরফে সোহরাবর্দিকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। যেমন, (১) বাঙলা-ভাগের প্রশ্নে তিনি গণভোটের প্রস্তাবে রাজি হবেন কি? সোহরাবর্দি উত্তর দেন যে, গণভোটের কথা চিন্তা করা আত্মহত্যার সমান।

(২) স্বাধীন বাঙলা কি পাকিস্তানে যোগ দেবে?

(৩) স্বাধীন বাঙলায় তিনি কি যৌথ-নির্বাচন-ব্যবস্থা মেনে নেবেন? দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে সোহরাবর্দি বলেন যে, স্বাধীন বাঙলাই সংবিধান তৈরি করে এ বিষয়গুলি ঠিক করবে। এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।[১২২] সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন এবিষয়ে জিন্না এবং অন্যান্য লীগ নেতাদের কী মত। সোহরাবর্দি উত্তর দেন,

'I speak for myself, I speak for Bengal. I am visualising an independent, undivided sovereign Bengal in divided India.'[১২৩]

সোহরাবর্দি তাঁর স্বাধীন বাঙলার প্রস্তাবকে সমর্থনের জন্য হিন্দুদের কাছে আবেদন করেন। বাঙলায় লীগের প্রগতিশীল অংশের মুখপাত্র ছিলেন সম্পাদক আবুল হাশেম। তিনি সোহরাবর্দির পরিকল্পনাকে সমর্থন করে বলেন,

'Let the Hindus and Muslims agree to C. R. Das's formula of 50 : 50 enjoyment of political power and economic privileges. I appeal to the youths of Bengal in the name of her past traditions and glorious future to unite, to make a determined effort to dismiss all reactionary thinking and save Bengal from the impending calamity.'[১২৪]

সোহরাবর্দি আর আবুল হাশেমের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন লীগের সভাপতি মৌলানা আকরম খাঁ। লীগের লাহোর প্রস্তাবকে সমর্থন করে তিনি বলেন,

.. a great deal of coufusion has resulted from statements by individuals from which the inference may be drawn that acute differences between the League High Command and the Bengal Muslim League exists on Pakistan issue Such an inference would be entirely erroneous and baseless. Muslim Bengal remains firmly wedded to the ideal defined unambiguously in the famous Lahore Resolution of 1940 and stands solidly behind the Qaid-e-Azam...''[১২৫]

আকরম খাঁর এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে স্বাধীন বাঙলার প্রশ্নে বাঙলার লীগ-নেতৃত্ব দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। জিন্নার একনিষ্ঠ সমর্থক নাজিমুদ্দিনও মনে করতেন যে স্বাধীন বাঙলা গঠিত হলে, এখানে বসবাসকারী মুসলমান ও অমুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।[১২৬] এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, সোহরাবর্দি, নাজিমুদ্দিন, আবুল হাশেম ও অন্যান্যরা লীগ হাই কমাণ্ড বা জিন্নার প্রচ্ছন্ন অনুমতি ছাড়া কিভাবে এগোলেন? মনে হয়, তাঁরা জিন্নার সঙ্গে মাউনটব্যাটেনের ১৯৪৭ সালের ২৬শে এপ্রিলের সাক্ষাৎকার থেকে সূত্র পান। মাউনটব্যাটেন এই সাক্ষাৎকারে অবিভক্ত বাঙলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে

যুক্ত না করার ব্যাপারে জিন্নার মতামত জানতে চাইলে জিন্না উত্তর দেন,

'I should be delighted. What is the use of Bengal without Calcutta. They had much better remained united and Independent; I am sure that they would be on friendly terms with us.'[১২৭]

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কংগ্রেস নেতারাও বিভিন্ন কারণে বাঙলাভাগের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। বাঙলার কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ বলেন,

"If we are forced to advocate partition of Bengal, it is no pleasure for us...But Mr. Suhrawardy and men of his party have made such a mess of the whole thing, that for the present no other way is left for Bengal."[১২৮]

অন্যদিকে কিরণশংকর রায় আর শরৎচন্দ্র বসু সোহরাবর্দি আর আবুল হাশেমের সঙ্গে একমত হন। এই পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার জন্য সোহরাবর্দি, ফজলুর রহমান, নুরুল আমিন নাজিমুদ্দিন ও অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হয়। শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বক্সী আলোচনায় যোগ দেন। আলোচনার পর স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙলা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফজলুর রহমান সাংবাদিকদের কাছে বসু-সোহরাবর্দি পরিকল্পনার কথা জানান। এই ৬-দফা প্রস্তাবগুলি ছিল,

(১) বাংলা একটি স্বাধীন, সার্বভৌম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

(২) প্রথমে সমাজতন্ত্রী বাঙলাদেশের সংবিধান তৈরি হবে। পরে যৌথ-নির্বাচনব্যবস্থা ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে বিধানসভা গঠিত হবে।

(৩) এই নির্বাচিত বিধানসভা বাঙলার সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক কী হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

(৪) বর্তমানে ক্ষমতাসীন লীগ মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিয়ে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক অন্তর্বর্তিকালীন মন্ত্রিসভা অবিলম্বে গঠিত হবে।

(৫) বঙ্গদেশের সরকারি চাকরিতে বাঙালিদের নিয়োগ করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের সমান-সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এবং

(৬) খসড়া সংবিধান তৈরির জন্য কংগ্রেস আর লীগ থেকে ৩০ বা ৩১ জন সদস্য নিয়ে একটি অ্যাডহক কমিটি তৈরি করা হবে। সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করে এই কমিটি সমাজতন্ত্রী বঙ্গদেশের সংবিধান তৈরি করবে।[১২৯]

এই ৬-দফা পরিকল্পনার কথা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। হিন্দুমহাসভার বাৎসরিক অধিবেশনে (১৪ই মে, ১৯৪৭) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, এই স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙলার পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে ইংরেজ আমলাশ্রেণী, ক্লাইভ স্ট্রীটের ইউরোপীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, কমিউনিস্ট পার্টি, সোহরাবর্দি এবং শরৎচন্দ্র বসুর সক্রিয় সমর্থন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে লাহোর প্রস্তাব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এক বা একাধিক মুসলমান রাষ্ট্র নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হবে। তিনি তাই বলেন, 'Sovereign Bengal is a sugar-coated alternative to Pakistan.'[১৩০] আকরম খাঁ বলেন যে, এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার অর্থ হল পাকিস্তান প্রস্তাবকে ধ্বংস করে সাড়ে তিন কোটি বাঙালি মুসলমানকে ইংরেজের হাত থেকে বর্ণ-হিন্দুদের হাতে সঁপে দেওয়া। আর বর্ণ-হিন্দুদের উদ্দেশ্য হল ক্ষমতাসীন লীগ মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজেদের দখলে রাখা যাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে সরকারকে কাজে লাগানো যায়।[১৩১] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পি. সি. যোশী

আর ভবানী সেন মন্তব্য করেন যে, 'আমাদের ধারণা লনডনে ভারতভাগের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই পরিকল্পনা যদি কার্যকর হয়, তবে ভারতের সমস্ত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের ভাগ্যে এক মহা বিপর্যয় ঘটবে। কংগ্রেস ও লীগের চুক্তির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বাঙলার পরিকল্পনা ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেবে।'[১৩২]

৯ই মে গান্ধীজি কলকাতায় এসে সোদপুর আশ্রমে অবস্থানকালে সোহরাবর্দি ও ফজলুর রহমান গান্ধীজির সঙ্গে প্রায় ৯০ মিনিট ধরে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজি এই পরিকল্পনার সম্ভাবনার কথা মেনে নেন বলে মনে হয়। এদিকে বাঙলাভাগের দাবি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই প্রস্তাবের সপক্ষে অনেক সভা-সমিতির আয়োজন করা হয়। নেলী সেনগুপ্তা এইরকম একটি জনসভায় বীরভূম যান এবং প্রায় ৬ হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা দেন। অন্যদিকে লীগ বাঙলাভাগের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে। লীগের পক্ষে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেন।[১৩৩]

ইতিমধ্যে বাঙলার লীগ-নেতারা শরৎচন্দ্র বসু আর কিরণশংকর রায়ের সঙ্গে চুক্তি করেন (২০শে মে, ১৯৪৭)। শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজিকে লেখেন,

'We arrived at a tentative agreement, copy of which is enclosed herewith for your kind consideration...It will, of course, have to be placed before the Congress and Muslim League organisations.'[১৩৪]

উত্তরে গান্ধীজি জানান, '.....Make sure that Central Muslim League approves of the proposal not withstanding reports to the contrary... I propose to discuss the draft with the Working Committee.'[১৩৫]

সোহরাবর্দি লীগ-নেতাদের আর জিন্নার সঙ্গে দেখা করে পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু জিন্না শেষ পর্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করায় সোহরাবর্দির স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হয় নি। অন্যদিকে শরৎ বসুর সঙ্গে আলোচনার পর কংগ্রেস নেতারাও অসম্মতি জানান। তাঁদের মনে আশঙ্কা জাগে যে, প্রস্তাবিত অখণ্ড বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন লীগ থেকে এবং তিনি হয়তো পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এইভাবে সোহরাবর্দি-শরৎচন্দ্র বসুর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : লীগ-নেতারা কেন এত দেরিতে অখণ্ড বাঙলার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে। বাঙলার লীগ-নেতারা লাহোর প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে স্বশাসিত রাজ্য বা স্টেটস তৈরি হবে। অর্থাৎ পূর্ব ভারত ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে দুটি রাজ্য তৈরি হবে, তবে এই রাজ্যগুলির মধ্যে কী সম্পর্ক থাকবে, প্রস্তাবে কিছুই বলা ছিল না। বাঙলার লীগ নেতারা আশান্বিত হন এই ভেবে যে, এই নূতন রাষ্ট্রে তাঁরা নিজেদের নূতনভাবে গড়ে তুলবেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে লীগের আইনসভার সদস্যদের কনভেনশনে স্টেটস শব্দটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। জিন্না বলেন যে, মুসলমানদের নূতন রাষ্ট্র হবে সার্বভৌম ও স্বাধীন পাকিস্তান। তিনি মূল প্রস্তাবের স্টেটস-এর জায়গায় স্টেট শব্দটি ব্যবহার করে প্রস্তাবটির আমূল পরিবর্তন করেন। লীগের কেউ এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় তিনি জানান যে স্টেট শব্দটি টাইপের ভুলে স্টেটস হয়ে গেছে। বাঙলার লীগ নেতারা বুঝতে পারেন যে প্রস্তাবিত পাকিস্তানে উত্তর-ভারতের উর্দুভাষী মুসলমানদের প্রাধান্য দেখা যাবে। পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের উপর ছড়ি ঘোরাবে উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানিরা। সোহরাবর্দি-আবুল হাশেমদের এই আশঙ্কা পরবর্তী কালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছেন। এই বিপদের আশঙ্কা করেই তাঁরা অখণ্ড বাঙলা দেশের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। তাঁরা অনুমান করেন যে, যদি এই পরিকল্পনা সুফল হয়, তবে (১) বাঙলায় উত্তর ভারতের উর্দুভাষী লীগ-নেতাদের আধিপত্য হ্রাস পাবে এবং (২) দীর্ঘদিনের হিন্দুদের যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য বর্তমান তা নিয়ন্ত্রিত হবে। ফলে বাঙালি মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। এই উপলব্ধি থেকেই সোহরাবর্দি বলেন, 'We Bengalis have a common mother tongue and common economic interests. Bengal has very little affinity with the Punjab. Bengal will be an independent state and decide by herself later whether she would link up with Pakistan'.[১৩৬] কিন্তু কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার পর সোহরাবর্দির অখণ্ড বাঙলার পরিকল্পনা সম্পর্কে হিন্দুরা সন্দিহান হয়ে ওঠে। অন্যদিকে লীগের অন্যান্য নেতারা জিন্নার পাকিস্তান স্বপ্নে বিভোর থাকায় সোহরাবর্দি-শরৎচন্দ্র বসুর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। ফলে অখণ্ড বাঙলার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন জিন্না প্রথম থেকে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন নি? জিন্না ঘোষণা করেন যে, পানজাব, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল, বালুচিস্তান, বাঙলা ও আসাম নিয়ে প্রস্তাবিত পাকিস্তান সৃষ্টি হবে। তাই দেখি, সোহরাবর্দির পরিকল্পনার প্রথমদিকে জিন্না কোনোরকম বাধা দেন নি। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, প্রস্তাবিত অখণ্ড বাঙলা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে যোগ দেবে। কিন্তু পরে এই পরিকল্পনার সব খতিয়ে দেখে বুঝতে পারেন যে বাঙলা এই মুহূর্তে কোনোভাবেই পাকিস্তানে যোগ দেবে না। বাঙলা পাকিস্তানে যোগ না দিলে ক্ষমতাহস্তান্তরের সময় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হতে পারে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার বাঙলা ও পানজাব ভাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সোহরাবর্দির প্রস্তাবে রাজি হলে সমস্ত বাঙলা হাতছাড়া হবে। আর ভাগাভাগি হলে বাঙলার অনেক অংশই পাকিস্তানে আসবে। তাই শেষ পর্যায়ে জিন্না সোহরাবর্দি-শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাবকে বাতিল করেন। আর কংগ্রেস নেতাদের আশঙ্কা হয় যে, সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভা যদি পাকিস্তানে যোগ দেয়, তবে বাঙলাদেশ একেবারেই হাতছাড়া হবে। তাই সর্দার প্যাটেল কিরণশংকর রায়কে কংগ্রেসের মূলসিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলার জন্য নির্দেশ দেন। কিরণশংকর রায় এরপর এই পরিকল্পনা নিয়ে আর এগোন নি।

অবশেষে ৩রা জুন মাউনটব্যাটেন ঘোষণা করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং বাঙলা আর পানজাবকে ভাগ করা হবে। এই ঘোষণার পর ২৩শে জুন এক বিবৃতিতে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত সোহরাবর্দি বলেন 'কষ্টের দিন শেষ হয়েছে। স্বাধীন, অখণ্ড বাঙলার পরিকল্পনাকে পেছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে, বাঙলা অচিরেই ভাগ হবে।'[১৩৭] বাঙলা আর পানজাব ভাগের খবর মুসলমানদের শোকাহত করে তোলে, অন্যদিকে হিন্দুরা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। সরকারি পাক্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, অবাঙালি মুসলমানরা কলকাতা হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয় এবং হাওড়ার কয়েকটি অঞ্চলে তারা লীগের পতাকা নামিয়ে দেয়। সাধারণ মুসলমানদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে লীগ-নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।[১৩৮] এই হতাশার ফলেই বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

এদিকে সীমান্ত কমিশনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য দুই সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রস্তুত হয়। লীগের তরফে ফজলুল হককে স্মারকলিপি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপিতে লীগ দুটি কারণে কলকাতা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায়। প্রথমত, পূর্ববাঙলার অর্থ আর সম্পদ

দিয়েই কলকাতার অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত, বাঙলার জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ মুসলমান।[৩৯] অন্যদিকে ২৪ পরগনা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ও যশোরের হিন্দু আর তফশিলি সম্প্রদায় এই অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানান।

এই অবস্থায় ২০শে জুন বিধায়করা বিধানসভায় বাঙলা-ভাগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। এইভাবে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান করে বাউণ্ডারি কমিশনের সুপারিশ বের হয় ১৮ই অগস্ট। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত চট্টগ্রাম ও ঢাকা ডিভিশন, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও রাজশাহীর পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জেলা নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হয়। এদিকে সমস্ত বর্ধমান বিভাগ, কলকাতা ও কলকাতা জেলা, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং পশ্চিমবাঙলার মধ্যে পড়ে। এছাড়া নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, মালদা ও জলপাইগুড়ির পাঁচটি জেলাকে পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। কমিশনের সুপারিশ কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু এই সুপারিশ মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব নিয়ে জিন্না যে সংগ্রাম আরম্ভ করেন, পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে সেই সংগ্রাম শেষ হয়, এবং জিন্নার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়।

তথ্যসংকেত

৫৭. Das Tarak Chandra, Bengal Famine, 1943 (Calcutta Un versity Publicarion, এই বইয়ের মুখবন্ধ দেখুন।)
৫৮. Sen Amartya, Poverty and Famines, an essay on entitlement and deprivation, Oxford, 1981, P 52-53.
৫৯. Acting Governor Rutherford's speech, broadcast from All India Radio, Calcutta, on 8 October, 1943.
৬০. Wolpert Stanley, op. cit, P 266.
৬১. B. L. A. P, Part-LXIX, No. 2, 1945, P 461.
৬২. Mansergh Nicolas, op. cit, vol. 4, 1944, P 634.
৬৩. Ibid, P 639.
৬৪. Fortnightly Reports, second half of April 1944.
৬৫. B. L. A. P, Part-LVIII, No. 5, 1944.
৬৬. Mansergh Nicolas, op. cit, vol. 5, P 29, 144.
৬৭. Ibid.
৬৮. Ibid
৬৯ Amrita Bazar Patrika, 29 March, 1945.
৭০. Pirzada S. S. (ed), Qaid-e-Azam Jinnah's Correspondence, P 290.
৭১. Ibid, P 292.
৭২. Sen Shila, op. cit, P 195.
৭৩. ফজলুল হকের এই টেলিগ্রামটি ১৯৪৬ সালের ২০শে মার্চ অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭৪. Amrita Bazar Patrika, 20 March, 1946.
৭৫. Ibid, 2 March, 1946.
৭৬. Ibid.
৭৭. Humayun Kabir's article "Bengal Elections 1946,—A Mockery", Amrita Bazar Patrika, 14 April, 1946
৭৮. Fortnightly Report, 1st half of March, 1946.
৭৯. Moulana Abul Kalam Azad's Report on 'Bengal Election' vide Amrita Bazar Patrika, 5 April, 1946.
৮০. De Amalendu, Islam in Modern India, P 221.
৮১. Sen Shila, op cit, P 196.
৮২. Rahim M. A., বাঙলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭—১৯৪৭, P 283.
৮৩. Statement of Suhrawardy, Amrita Bazar Patrika, 23 April, 1946.
৮৪. Ibid, 22 April, 1946.
৮৫. কিরণশংকর রায়কে লেখা সোহরাবর্দির লিখিত ১৯শে এপ্রিলের চিঠি থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়।
৮৬. Wolpert Stanley, op. cit, P 267.
৮৭. Statement of Suhrawardy, vide Amrita Bazar Patrika, 11 August, 1946.
৮৮. Amrita Bazar Patrika, 8 August, 1946.
৮৯. Ibid, 12 August.
৯০. Majumder R. C., Hist. of Freedom Movement, Vol. III, P 643.
৯১. Ispahani ১৬ই অগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণাকে সমর্থন করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে লীগ সমর্থকরা ১৬ই অগস্ট ময়দানের জনসভায় যাতে বেশি সংখ্যায় যোগ দিতে পারে, তাই এই দিনটিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয়।
৯২. Fortnightly Report, second half of August, 1946.
৯৩. Report of the Police Commissioner on the disturbances and action taken by the Calcutta Police between the 16th and 28th Aug., 1946, inclusive, Govt of Bengal, Home (Pol.).
৯৪. Moon P. (ed) Wavell, The Viceroy's Journal, P 330.
৯৫. Miscellaneous Reports on the Calcutt Disturbances August, 1946, Govt. of Bengal, Home (Pol.), P 6.
৯৬. Fortnightly Report, 2nd half of August, 1946.
৯৭. Report of the O C, Rescue Organisation from Miscellaneous Reports, P 10.
৯৮. Sen Shila, op. cit, P 214, Also see Viceroy's Journal, P 339.
৯৯. Report of the Fire Brigade from Miscellaneous Report, P 121.
১০০. Statement of Jyoti Basu, vide B. L. A. P, Vol. LXXI, No. 3, 1946, P 126-127.
১০১. Statement of Bimal Kanti Ghosh, vide B. L. A. P, Vol. LXXXI, No. 3, 1946.
১০২. Statement of Jyoti Basu, Ibid.
১০৩. Statement of Bimal Kanti Ghosh, Ibid.

১০৪. Before August the 16th Report of the Police Commissioner, 1946, Govt. of Bengal, P iii.
১০৫. Ibid.
১০৬. Statement of Fazlul Huq vide B. L. A. P, Vol. LXXI, No. 3, 1946, P iii.
১০৭. Day to Day summary of arrests made, Report of the Police Commissioner, Home (Pol.) P 126.
১০৮. Statement of Fazlul Huq, vide B. L. A. P.
১০৯. Noakhali District area—1658 Sq miles
Population—22,17,042
Muslims —18,03,937
Hindus — 4,12,261
Muslim Percentage 81·4
Hindu " 18·6
Number of villages 1738 (1941 Census)
১১০. Amrita Bazar Patrika, 20 October, 1946. Rajendralal Roychoudhury, brother of historian, Professor Dr. M. L. Roychoudhury along with 22 members of his family, lost their lives in this communal riot at Noakhali in October, 1946.
১১১. Wavell to Pethick Lawrence, Mansergh, op. cit, Vol. 9, Document No 8.
১১২. Burrows to Pethick Lawrence, Mansergh, op. cit, Vol. 9, Document No. 51.
১১৩. Wavell to Pethick Lawrence.
১১৪. Fortnightly Reports, 2nd half of April, 1947.
১১৫. Ibid, 2nd half of March, 1946.
১১৬. Ibid, 1st half of May, 1947.
১১৭. দে অমলেন্দু, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি, পৃ ৪।
১১৮. Ibid.
১১৯. Moon P. (ed) op. cit, P 423.
১২০. Amrita Bazar Patrika, 12 April, 1947.
এই স্মারক-লিপিতে সই করেছিলেন পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রলাল খাঁ, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, বীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, আনন্দমোহন পোদ্দার, দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার রায়চৌধুরী, সুরপৎ সিং, সত্যেন্দ্রকুমার দাস এবং জে. ঘোষাল।
১২১. Statement of Suhrawardy vide Amrita Bazar Patrika, 28 April, 1947.
১২২. Ibid.
১২৩. Ibid.
১২৪. Statement of Abul Hasim, Amrita Bazar Patrika, 1 May, 1947.
১২৫. Statement of Akram Khan, Amrita Bazar Patrika, 5 May, 1947, Star of India, 5 May, 1947.
১২৬. Sen Shila, op. cit, P 231.

১২৭. Mansergh, op. cit, Vol. X, P 451, Mountbatten Paper.
১২৮. Statement of S. M. Ghosh, Amrita Bazar Patrika, 2 May, 1947.
১২৯. Amrita Bazar Patrika, 13 May, 1947.
দে অমলেন্দু, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি, পৃ ৩১।
১৩০. Amrita Bazar Patrika, 15 May, 1947.
১৩১. Statesman, 15 May, 1947.
Amrita Bazar Patrika, 15 May 1947.
১৩২. De Amalendu, op. cit, P 87
১৩৩. Fortnightly Report, 2nd half of May, 1947.
১৩৪. Letter of Sarat Chandra Bose to Mahatma Gandhi, dated 23 May, 1947.
১৩৫. Letter of Mahatma Gandhi, dated 24 May, 1947.
১৩৬. Wolpert Stanley, op. cit, P 320.
১৩৭. Statement of Suhrawardy, 21 June, 1947.
১৩৮. Wolpert Stanley, op. cit, P 329.
১৩৯. Chattopadhyay Pronab Kumar, Urban Leftist Movement 1937—1949, Unpublished Thesis, University of Calcutta.

মানুষের দাম

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

একদিন সকালে একটা মিছিল এসে হাজির হল রাজপ্রাসাদের সিংদরজায়। মিছিলের মধ্যিখানে একটা শকটের ওপর শাদা কাপড়ে ঢাকা এক মৃতদেহ।

মিছিলের লোকজন মনে হল,—খুবই উত্তেজিত। তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠছে আর নামছে। সঙ্গে চলছে ঘন-ঘন সমবেত চিৎকার। সবাই একসাথে চিৎকার করছে বলে তাদের বক্তব্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শুধু একটা শব্দের ঢেউ কানে এসে আছড়ে পড়ছে।

রাজপ্রাসাদের সিংদরজা তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হল। সিংদরজায় একজন প্রাসাদ-নিরাপত্তা-আধিকারিক কয়েকজন রক্ষীকে নিয়ে প্রহরারত। সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করার অনুমতি কে পাবে আর কে পাবে না—এই ব্যাপারটা নির্ভর করে এই আধিকারিকের বিবেচনার ওপর। কিন্তু কী ব্যাপারে এই বিক্ষোভ, যে মৃতদেহটি নিয়ে আসা হয়েছে এখানে—সেটি কার, —এসব কিছুই বুঝতে পারছে না সে। একজন লোক হাত তুলতেই সমবেত চিৎকার থেমে গেল। সম্ভবত সে-ই এই মিছিলের নেতা। কোত্থেকে একটা উঁচু কাঠের বেদি বয়ে নিয়ে এল কয়েকজন। সেই বেদির উপর দাঁড়িয়ে লোকটি চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করল। অপূর্ব বাচনভঙ্গি নেতার। সবাই মনোযোগ দিয়ে তার বক্তব্য শুনছে। আধিকারিক আর রক্ষীরাও মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে লাগল :

বন্ধুগণ! আপনারা জানেন গত কুড়ি বছর ধরে লাগাতার এই রাজ্য শাসন করছেন অপদার্থ এক রাজা এবং তাঁর ততোধিক অপদার্থ অমাত্যবর্গ। এঁরা মোটেই প্রজাদরদি নন। তাদের সুখ-সুবিধের দিকে কোনো নজরই এঁদের নেই। শুধু নিজেদের খাম-খেয়ালিপনা আর বিলাসিতা নিয়ে মশগুল। গত কুড়ি বছরে এই রাজ্যের কোনো উন্নতি তো হয়ই নি; বরং অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়েছে।

প্রশাসনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আজ দুর্নীতির চূড়ান্ত। কর্মচারীরা কাজ না করেও মাইনে পায়। চোর চুরি

করলেও তার শাস্তি হয় না। এমনকী মানুষের জীবনও আজ মূল্যহীন এই রাজার কাছে। কিংবা যদিও বা কিছু মূল্য থেকে থাকে—তা বৈষম্যমূলক। ব্যাপারটা আপনাদের ব্যাখ্যা করে বলছি···আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, এই রাজ্যে একটা বিচিত্র নিয়ম চালু আছে। কোনো মানুষ যদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যায়, তাহলে মৃতের পরিবারবর্গকে রাজকোষ থেকে টাকার অঙ্কে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যেটা সবথেকে অদ্ভুত মনে হয় আমাদের, সেটা হল এই যে, এই ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক সবার ক্ষেত্রে এক নয়। টাকার অঙ্ক কত হবে সেটা নির্ভর করে মৃত ব্যক্তি সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষ তার ওপর। আমাদের সামনে এখন যে মৃতদেহটি দেখছেন সেটি একজন শ্রমজীবী মানুষের। সহজ করে বলতে গেলে—একজন মজুরের। গতকাল বিকেলে রাজারই একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে বেচারার মৃত্যু হয়েছে। কোনো দোষ ছিল না লোকটির। নিয়মমতো রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষেই ও হাঁটছিল। সারাদিন কাজ করার পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছিল। পেছন থেকে গাড়িটা আসছিল ঝড়ের গতিতে। চালক সম্ভবত প্রচুর মদ্যপান করেছিল। দুর্ঘটনার মুহূর্তে চালকের গাড়ির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। রাস্তায় একটা বাঁক নিতে গিয়ে অতর্কিতে গাড়িটা পেছন থেকে ধাক্কা মারে এই লোকটিকে। ঘটনাস্থলেই ওর মৃত্যু হয়। পথচারীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। উচ্চপদস্থ সেই রাজকর্মচারী যিনি গাড়িতে আসীন ছিলেন, একবারও গাড়ি থামাতে বলেন নি। মৃত লোকটির পরিচয় জানতে চান নি। এলাকার মানুষ ব্যাপারটা নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ। আজ ভোরবেলা মৃতের আত্মীয়স্বজন যখন শবদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করছিল, তখন ক্ষতিপূরণের আদেশ তাদের জানানো হয়। সেই আদেশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুর্ঘটনায় মৃত ওই লোকটির জন্যে তার পরিবারবর্গকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। টাকার অঙ্কটা শুনেই সকলের মাথায় আগুন জ্বলে যায়। কিছুদিন আগে একজন অধ্যাপক ওই এলাকায় প্রায় একইভাবে দুর্ঘটনায় মারা যান। তখন ওই অধ্যাপকের পরিবারবর্গের জন্য যে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়, তাঁর টাকার অঙ্ক ছিল দশ হাজার। আমাদের প্রশ্ন হল,—অধ্যাপকের ক্ষেত্রে যদি দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়, তাহলে একজন মজুরের ক্ষেত্রে তা পাঁচ হাজার হবে কেন? দুজনেই তো মানুষ। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার ছিল দুজনেরই। নিজের-নিজের সংসারে প্রয়োজনীয়তা ছিল দুজনেরই। তাহলে কোন্ যুক্তিতে একজন অধ্যাপকের জীবনের দাম একজন মজুরের জীবনের দামের থেকে বেশি ধার্য হল? বন্ধুগণ! মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আমরা কোনো মতেই মেনে নিতে পারি না। সৎকার না করে মৃতদেহ রাজপ্রাসাদ অব্দি বয়ে আনা হয়েছে। স্বয়ং রাজার সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। তাঁর কাছে আমাদের প্রশ্ন—ক্ষতিপূরণের টাকায় এরকম বৈষম্যের কারণ কী? যদি রাজা আমাদের সঙ্গে দেখা না করতে চান, আমাদের কথা শুনতে না চান, তাহলে এই মৃতদেহ সামনে রেখে আমরা সবাই এখানে অনশন শুরু করব। যতক্ষণ না আমাদের প্রশ্নের জবাব স্বয়ং রাজার মুখ থেকে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা এই অনশন ভাঙব না, কিছুতেই না। প্রয়োজন হলে আমৃত্যু অনশন চলবে·····।

এখানে নেতা তার ভাষণ থামালে উপস্থিত জনমণ্ডলী করতালিতে ভরিয়ে দিল আকাশ-বাতাস। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সমবেত চিৎকার ধ্বনিত হল : মানুষের জীবন নিয়ে কোনোরকম বৈষম্য করা চলবে না! ক্ষতিপূরণের টাকায় কোনোরকম বৈষম্য করা চলবে না! আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে! ····· চলছে, চলবে!·····

নিরাপত্তা আধিকারিক কী সিদ্ধান্ত নেবে বুঝতে পারছে না। এত মানুষের এই বিশাল মিছিলকে লাঠিপেটা ক'রে ছত্রভঙ্গ করে দেবে? নাকি সিংদ্বারের কপাট খুলে দেবে? কিন্তু মিছিলকে কোনোমতেই প্রাসাদ-চত্বরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া যায় না। আইন অনুসারে বলতে গেলে এত মানুষের প্রাসাদ-চত্বরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবশ্য প্রাসাদ-চত্বরে ঢোকবার অনুমতি মিললেই যে-কোনো ব্যক্তি রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারবে—তা নয়। ঠিকমতো বলতে গেলে, অভাব-অভিযোগ বা ক্ষোভের কথা রাজাকে জানাতে হলে তাঁর অনুমতি নেওয়া একান্তই প্রয়োজন। প্রথমে এই অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। কমপক্ষে দিন পনেরো আগে এই দরখাস্ত রাজার এজলাসে নির্দিষ্ট দপ্তরে জমা পড়া চাই। সেই দরখাস্ত পড়ে অনুমতি দেওয়া যায় কিনা এই ব্যাপারটা বিবেচনা করার জন্যে নিযুক্ত আছে একজন আধিকারিক। এই আধিকারিকের প্রথম কাজ হল—যে তারিখে রাজার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে, সেই তারিখে রাজা সত্যিই দেখা করতে পারবেন কিনা—এটা খতিয়ে দেখা। এরকম হতে পারে যে, সেই দিনই রাজার কোনো জরুরি অধিবেশন আছে। কিংবা বিদেশ থেকে অন্য কোনো রাজার দূত দু-দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ওই দিন আলোচনায় আসবেন। যেদিন এরকম ব্যাপার থাকে, সেদিন স্বাভাবিক কারণেই প্রজাদের সঙ্গে রাজার সবরকম সাক্ষাৎকার বন্ধ। সুতরাং সাক্ষাৎকারীর ওই দিনের দর্শনপ্রার্থনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

সিংদরজার সামনে মিছিলের মানুষেরা ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছে। থেকে-থেকে সমবেত চিৎকার উঠছে—দরজা খুলে দিন! দরজা খুলুন! নাহলে দরজা ভাঙব আমরা! বেশ কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে সিংদরজায় ধাক্কা দিতেও শুরু করেছে। শক্ত লোহার সিংহদ্বার। সহজে ভাঙবার নয়। প্রাসাদের চারিদিকে কারাগারের মতো উঁচু পাঁচিল। কোনো মানুষের পক্ষে সেই পাঁচিল টপকানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেসব দিক দিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু অনেকে একসঙ্গে সিংহদ্বারে ধাক্কা দেওয়ায় ঝনঝন শব্দ উঠছে! এবং এরকম ধাক্কা দেওয়াও আইনবিরুদ্ধ কাজ। উত্তেজনা যেরকম বাড়ছে, তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এখনই এদের শান্ত করা দরকার। কিন্তু কী বলে এদের শান্ত করা হবে? নিরাপত্তা আধিকারিক বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। যতদূর সে জানে—আজ রাজ্যের বাৎসরিক আয়ব্যয় এবং পরিকল্পনার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক অধিবেশনে রাজা সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। এদের সঙ্গে আজকে দেখা করার কোনো প্রশ্নই নেই। রাজা সে সময়ই পাবেন না। কিন্তু উত্তেজিত এই বিশাল জনতাকে যদি সে কথা জানানো হয়, তাহলে উত্তেজনা বাড়বে বই কমবে না। জনতার যা চেহারা এখন সে দেখছে—হয়তো মুহূর্তের মধ্যে এরা মারমুখীও হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে সে কিভাবে তা সামাল দেবে? সে কি রক্ষীদের বলবে লগুড়াঘাত করতে? কিন্তু প্রায় হাজার দুই মানুষ,—আর তার সঙ্গে মাত্র ছ-জন রক্ষী। তারা একসঙ্গে কতজনের ওপর লগুড়াঘাত করবে? আর যদি তাতেও কাজ না হয়? তাহলে? তাহলে তো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আদেশ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রাণহানি হতে পারে। মিছিলের জনতার ওপর যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ছিল—এ ব্যাপারটা পরে প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাবে তারই ওপর। সে এক মহা ঝামেলা। তার থেকে ওইসব ঝামেলায় না গিয়ে সে তার ঊর্ধ্বতন অধিকারিকের কাছে পরিস্থিতি জানিয়ে নির্দেশ চাইবে। যেমন নির্দেশ আসবে সেরকমই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং পরিস্থিতি জানাতে হলে তাকে নিজে মুখেই জানাতে হবে। যেতে হবে তার

ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের কাছে। এরকম সাত-পাঁচ ভেবে নিয়ে নিরাপত্তা অধিকারিক সিংহদ্বারের সামনে উত্তেজিত জনতার ওপর কড়া নজর রাখার আদেশ দিল রক্ষীদের, এবং হন্তদন্ত হয়ে নিজেই গেল তার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের কাছে।

এই আধিকারিকের নাম সংক্ষেপে পাইনমশাই। যেমন লম্বা, তেমনি মোটা। চলন্ত পাইনকে দেখলে মনে হয়, মাংস আর চর্বির একটা বিশাল পাহাড় যেন হাঁটছে। ঝকঝকে সামরিক-পোশাক-পরিহিত পাইন ইংরাজি 'এল' আকৃতির একটা টেবিলের ওপারে পুরু গদিতে মোড়া এক আসনে বসেছিলেন। তাঁর টেবিলের একধারে পরপর সাজানো নানা রঙের পাঁচটা দূর-আলাপন যন্ত্র। আর একধারে অনেক নথির স্তূপ। টেবিলে একটা নথি খোলা পড়ে আছে। ওটা যে খুব পুরোনো তা পৃষ্ঠার ধূসর রঙ দেখলেই বোঝা যায়। নথিটা নিশ্চয়ই খুব জটিল, কেননা পাইনমশাই সেটা সামনে খুলে রেখে, দু-চোখ বন্ধ করে,—কপাল কুঁচকে সম্ভবত গভীর কোনো চিন্তায় ডুবে আছেন। নিরাপত্তা আধিকারিক ঘরে ঢুকেই মেঝেতে ভারী বুটের আওয়াজ তুলে এক জমকালো অভিবাদন জানাল। পাইনমশাই চক্ষু উন্মীলন করলেন।

—কী ব্যাপার? কোঁচকানো কপাল তাঁর আরও কুঁচকে গেল।

—আজ্ঞে, প্রাসাদের সিংহদ্বারে একটা গণ্ডগোল বেধেছে···

—গণ্ডগোল? কেন?

—অনেক মানুষের একটা মিছিল এসেছে আজ্ঞে, ···মিছিলের মাঝখানে একটা মৃতদেহ··।

—মিছিল?···মৃতদেহ?—কেন?

—আধিকারিকদের মধ্যে কারুর একজনের গাড়িতে একটা লোক চাপা পড়ে মারা গেছে। প্রতিবাদ জানাতে প্রায় হাজার দুই মানুষের একটা মিছিল···। ওরা আজ্ঞে, রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায়··।

—রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায়!···ভেংচে উঠলেন পাইনমশাই—রাজার সঙ্গে দেখা করা কি চা-পানের মতো সোজা ব্যাপার? সিংহদ্বারের সামনে আইন করে জমায়েত বন্ধ করা আছে তুমি জান না? ওদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে মিছিল হটিয়ে দাও! জুলুমবাজি পেয়েছে নাকি? রাগে পাইনমশাইয়ের থলথলে মুখ ক্রমশ লাল হয়ে ওঠে।

নিরাপত্তা অধিকর্তা মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি এবার ধমকে ওঠেন—যাও! আর দেরি কোরো না···, মিছিল হটিয়ে দিয়ে আমাকে খবর করো!

—তাহলে আজ্ঞে আপনার নির্দেশ কী? ভয়ে-ভয়ে অধিকর্তা জিজ্ঞেস করে।

—মানে?

—মিছিল কীভাবে হঠাব? লাঠি চালিয়ে? না গুলি করে? পাইন আবার ধমকে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কী ভেবে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—চলো তো,—ব্যাপারটা অলিন্দ থেকে একবার স্বচক্ষে দেখে আসি।

পাইনমশাইয়ের দপ্তরের অলিন্দ থেকে প্রাসাদের সিংদরজার দূরত্ব অনেকখানি। সুতরাং খুব যে স্পষ্ট করে সবকিছু দেখা গেল, তা নয়। দূর থেকে শুধু এটাই বোঝা গেল যে, পিঁপড়ের মতো অজস্র মানুষ সিংদরজার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভালোভাবে দেখার জন্যে পাইন দূরবীন নিয়ে এলেন দপ্তরের আলমারি থেকে। সেটা চোখে লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি। বুঝলেন যে নিরাপত্তা আধিকারিকের আন্দাজ ঠিকই। মিছিলে মানুষের সংখ্যা দু-হাজার কেন, তারও বেশি, তিন হাজারও হতে পারে। এতক্ষণে রাগ বেশ কমছে পাইনের। বিবেচনা কাজ করতে শুরু করেছে। তিনি বুঝলেন—এত মানুষকে সিংদ্বারের কাছ থেকে হঠানো খুব সহজ নয়। তাতে

ছু-পক্ষে একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। অনেকে আহত তো হতেই পারে। এমনকী প্রাণহানি ঘটাও অসম্ভব কিছু নয়। আর প্রাসাদের সিংদ্বারের সামনেই যদি এরকম রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে, তাহলে সুযোগের অভাবে ওত পেতে থাকা বিরোধী-পক্ষের লোকজনদের সুবিধেই হয়ে যাবে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে—এসব নিয়ে তারা মহা হইচই শুরু করে দেবে। বর্তমান রাজার পদত্যাগ দাবি করে হয়তো দেশ জুড়ে লাগাতার আন্দোলনও শুরু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। মন্ত্রীর কানে ব্যাপারটা তোলা উচিত। কিন্তু তার আগে—। পাইনমশাই আধিকারিককে জিজ্ঞেস করলেন—এদের দাবিটা কী?

—আজ্ঞে,—একজন লোক গতকাল দুর্ঘটনায় মারা গেছে—

—সে তো শুনলাম। এক কথা বারবার বলছ কেন? খুব সংক্ষেপে বলো ওরা কী চায়।

—আজ্ঞে, ওরা রাজামশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। সে তো আগেই বলেছি। আধিকারিক ভয়ে-ভয়ে তাকায় পাইনের দিকে।

—কেন সাক্ষাৎ করতে চায়?

—যে লোকটি মারা গেছে তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ কিছুদিন আগে একজন অধ্যাপক দুর্ঘটনায় মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল—দশ হাজার টাকা। এরকম বৈষম্যের বিরুদ্ধেই ওদের প্রতিবাদ—।

—হুঁ। ··কিন্তু এ ব্যাপারটায় তো আমাদের কিছু বলার নেই হে। আমরা তো শুধু আইন-শৃঙ্খলা দেখি। কিন্তু মানুষ মরলে ক্ষতিপূরণের টাকা একরকম হবেনা নানারকম হবে সেটা তো নীতি সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের গণ্ডিতেও পড়তে পারে। এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটা জানতে হলে মন্ত্রীকেই ফোন করতে হবে। এসো,—ফোন করে দেখি—।

•

অধিবেশনকক্ষে তখন রাজার উপস্থিতিতে তুমুল বৈঠক চলছে। আগামী বছরের পরিকল্পনা-খাতে উন্নয়ন-খাতে কত কোটি টাকা ধার্য করা হবে—এই ব্যাপারটা নিয়ে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে মহা বিতর্ক বেধে গেছে। রাজামশাই সিংহাসনের নরম গদিতে পিঠ ডুবিয়ে এক-একজনের অভিমত মন দিয়ে শুনছেন। সামনে লম্বা টেবিলের ওপর নানা ধরনের মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল সুদৃশ্য সব রেকাবিতে সাজানো। সদস্যরা ইচ্ছেমতন আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে সেসব খাবার মুখে দিয়ে চিবোচ্ছেন। রাজা ভাজা কাজুবাদাম খুবই পছন্দ করেন। সেজন্যে তাঁর সামনে বেশ বড়ো একটা রেকাবিতে কাজুবাদামের ক্ষুদ্র একটা পাহাড়। তিনি প্রায়ই মুঠো-মুঠো বাদাম তুলে মুখে দিচ্ছেন। রাজার বাঁ-পাশে বসে আছেন মন্ত্রী। তাঁর সামনে প্রচুর নথি। আলোচনার সুবিধার জন্যে যখন যেটা দরকার রাজাকে এগিয়ে দিচ্ছেন। মন্ত্রী যেখানে বসে আছেন তার কাছাকাছিই দূর-আলাপন যন্ত্র। পিঁ··· পিঁ···পিঁ···যন্ত্রটা বাজল। ভুরু কুঁচকে গেল মন্ত্রীর। এ সময় আবার কে বিরক্ত করছে? বৈঠক চলাকালীন অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছাড়া কেউ যাতে এখানে দূর-আলাপন না করে সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। তাহলে যন্ত্রটা বাজছে কেন? কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল? যন্ত্রটা নাচোড়বান্দার মতো বেজেই চলেছে। অগত্যা সেটা ধরতে হল মন্ত্রীকে। রিসিভার তুলে খুব নীচু গলায় উনি বললেন—

—হ্যালো—

—আজ্ঞে, আমি নিরাপত্তা দপ্তরের পাইন বলছি।

—কী ব্যাপার? এখন তো অধিবেশন চলছে।

—বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, আজ্ঞে—। কিন্তু একটা জরুরি ব্যাপারে বাধ্য হয়ে—

—ব্যাপারটা কী তাড়াতাড়ি বলুন।

—একটা মিছিল প্রাসাদের সিংদ্বার অবরোধ করেছে।

—অবরোধ? কেন? ওখানে বাহিনী নেই?

—আছে আজ্ঞে। কিন্তু সমস্যাটা একটু অন্য-রকম—। প্রায় হাজার চারেক মানুষের একটা মিছিল (পাইন ইচ্ছে করেই সংখ্যাটা বাড়িয়ে বললেন) সিংহ-দ্বারের সামনে জমায়েত হয়েছে। সঙ্গে একটা মৃতদেহ। ওরা মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। ওদের প্রশ্নের জবাব চায়—।

—প্রশ্ন? রাজাকে আবার কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারে নাকি?

—আজ্ঞে, লোকগুলো ভীষণ বিক্ষুব্ধ। ওদের অভিযোগ হচ্ছে—দুর্ঘটনায় মৃত মানুষের পরিবারকে যে রাজকীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা, সেই অর্থের অঙ্কে একটা বৈষম্য আছে—।

—বৈষম্য?

—আজ্ঞে! অধ্যাপক মারা গেলে দেওয়া হয়—দশ হাজার। আর মজুর মারা গেলে—পাঁচ হাজার।

তা তো হবেই! মন্ত্রী বলতে যাচ্ছিলেন। বুদ্ধি-জীবী আর শ্রমজীবীর মধ্যে একটা বৈষম্য থাকবে না? মুড়ি আর মিছরির একই দর হবে? কিন্তু এখন অধিবেশন চলছে। এসব ব্যাপার বুঝিয়ে বলার এত সময় নেই। তাই তিনি পাইনকে উত্তর দিলেন—অত কথা শোনার এখন সময় নেই। যেভাবে হোক ব্যাপারটা সামলান।

কিভাবে সামলাব? ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশ কী আছে সেটা তো আমি জানি না। আমার নথিতে ওসব ব্যাপারে কোনো নির্দেশিকা নেই। আপনি বরং যদি প্রশাসনিক দপ্তরের সচিবকে এখানে পাঠিয়ে দেন। উনি ব্যাপারটা মিছিলের লোকজনদের বুঝিয়ে বলতে পারেন—।

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় মন্ত্রীর।

—ঠিক আছে। সচিবকে আমি ঘটনাস্থলে যেতে বলছি।

একটু পরেই সচিবকে ফোন করেন তিনি। সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করে ঘটনাস্থলে যেতে নির্দেশ দেন।

•

আধঘণ্টাও কাটল না। সচিব হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিরে এলেন অধিবেশনকক্ষে। মন্ত্রীর কানে-কানে বললেন—আজ্ঞে, পরিস্থিতি খুব খারাপ। উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। মিছিলে লোকজনও ক্রমশ বাড়ছে। সকালের দিকে নাকি তিন হাজার ছিল। এখন সংখ্যাটা বেড়ে পাঁচ হাজার হবে। এত লোককে আমি কী বোঝাব? কেউ কোনো কথাই শুনছে না। সকাল থেকে বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে ওরা ভীষণ অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

—সে কি, সচিব, আপনার কথাও শুনছে না?

—আজ্ঞে, কারোর কথাই মনে হয় ওরা শুনবে না। ওদের দাবি একটাই—প্রাসাদের গেট খুলে দেওয়া হোক। স্বয়ং রাজাসাহেবকে ওরা ওদের বক্তব্য জানাবে—।

সমস্যাটা সত্যিই বেশ পাকিয়ে উঠেছে। মন্ত্রী ভাবলেন। আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। গুরুতর কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই রাজার কানে তুলে দেওয়া ভালো। অনেক দিন চাকরি হয়ে গেল মন্ত্রীর। এই রাজার রাজত্ব যবে থেকে শুরু হয়েছে ততদিন থেকেই তিনি ক্ষমতায় আছেন। প্রথমে অবশ্য তত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পান নি। হিংস্র-পশু-সংরক্ষণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ক্রমশ পদোন্নতি হয়। এখন তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক দিকের প্রায় সবটাই দেখেন। এখন তাঁর একাধিক দপ্তর। সে যাই হোক, অভিজ্ঞতা তাঁর কম হল না। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এটাই বুঝেছেন যে, যখন

কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে, তখন সেই সমস্যা নিজের ঘাড়ে না রেখে অন্যের ঘাড়ে ফেলে দিতে হবে। নাহলে অনেক হ্যাপা সামলাতে হয়। এখন এই ঝামেলার খবরটা রাজাকে জানালে তাঁর দায়িত্ব খানিকটা লাঘব হবে। কিন্তু রাজা তো এখন গভীর মনোযোগ দিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা শুনছেন। তাঁকে কিছু বলতে যাওয়া মানেই তাঁর বিরক্তির উদ্রেক করা। কিন্তু কী আর করা যাবে। নিজের আসন ছেড়ে তিনি রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। গলা ঝাড়লেন কয়েকবার।

রাজা মুখ তুলে চাইলেন।

—কী ব্যাপার ?

—মহারাজ, একটা সমস্যা।

—সমস্যা ? আমার রাজ্যে··· ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

যতটা সম্ভব গুছিয়ে এবং সংক্ষিপ্তভাবে মন্ত্রী সমস্যাটার বিবরণ দিলেন। রাজার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভেবে নেওয়ার পর তিনি বললেন—এখন পরিস্থিতি কেমন আছে নিরাপত্তা-আধিকারিককে জিজ্ঞেস করুন।

মন্ত্রীর ফোন পেয়ে পাইন উত্তেজিত গলায় জানালেন—

আজ্ঞে, পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো। জনতা অধৈর্য হয়ে আমাদের রক্ষীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছে।

—তাই নাকি ? আচ্ছা দেখছি, কী করা যায়।

রাজাকে জানাতে খুবই রেগে গেলেন উনি। বললেন—আর আমার রক্ষীরা কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘাস চিবোচ্ছে ? হোসপাইপে জল ছুঁড়ে এখনই মিছিলের লোকজনকে দূরে সরিয়ে দিতে বলুন।

মন্ত্রী আবার ফোনে সেরকমই পরামর্শ দিলেন পাইনকে। ইতিমধ্যে অধিবেশন শেষ। ফাঁকা হয়ে গেল পরামর্শকক্ষ। শুধু রাজা আর মন্ত্রী দুজনে মুখোমুখি বসে আছেন। রেকাবি থেকে একটা টকটকে লাল, লোভনীয় আপেল তুলে নিয়ে কামড় বসিয়ে রাজা অল্প হেসে বললেন—মন্ত্রী ?

—আজ্ঞে ?

—কিছু ভাবছেন ?

—আজ্ঞে মহারাজ···না···।

—কিছু ভাবছেন না ? সমস্যার সমাধানের কথা কিছু ভাবছেন না ?

—সমস্যাটার কথা তো নিশ্চয়ই ভাবছি। কিন্তু সমাধানটা ঠিক মাথায় আসছে না। কুড়ি বছরেরও বেশি রাজত্ব চলছে আমাদের। কোনোদিন এরকম অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে নি। এত সাহস এ রাজ্যের মানুষের হয়নি যে-সিংহদ্বারের সামনে জোটবদ্ধ হয়ে গণ্ডগোল শুরু করবে। আমার মনে হয় এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পেছনে ষড়যন্ত্র আছে! বিরোধী পক্ষের ষড়যন্ত্র···!

—মন্ত্রী, আপনার অনুমান সত্যি হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। রাজত্ব চালাতে হলে, প্রশাসন চালাতে হলে কতকগুলো ব্যাপার বুঝে নেওয়া উচিত। যেমন—

—যেমন মহারাজ ?

—আমাদের যেমন অসুখ করে মাঝে-মাঝে, শরীরে ঘা হয়, ফোড়া হয়, তেমনি রাজ্যেও মাঝে-মাঝে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ···এইসব মাথা চাড়া দিতে পারে। তাতে কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না। রোগের যেমন কড়া চিকিৎসা আছে, তেমনি এইসব বিক্ষোভ এবং আন্দোলনও দমন করার উপায় আছে। কিভাবে দমন করবেন ?

—আজ্ঞে, মহারাজ, বাহুবল দিয়ে। গুলি চালিয়ে। এ ছাড়া আর এসব ঠাণ্ডা করার উপায় কী?

—ঠিকই বলেছেন। তবে তার আগে ভালভাবে চিন্তা করে নিতে হবে···। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি —ক্ষতিপূরণের টাকার ব্যাপারে আজকের যে বিক্ষোভ-এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী। মানুষের জীবনের দামে সত্যিই কি কোনো তারতম্য থাকার

কথা ?

—একটা কথা বলার আছে, মহারাজ। যদিও আমরা শ্রেণীহীন সমাজে বিশ্বাস করি, কিন্তু তা তো তৈরি করতে পারি নি এখনও! পুরোনো খোল-নলচে নিয়েই সমাজ চলছে। শ্রেণীহীন সমাজের জন্য আমরা প্রয়াস চালাচ্ছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। এখন যতদিন সমাজ শ্রেণীহীন না হচ্ছে,—ততদিন প্রচলিত কাঠামোকেই মেনে নিতে হবে আমাদের। একজন অধ্যাপক সমাজের যে শ্রেণীর মানুষ,—একজন মজুর তো সমাজের সেই একই শ্রেণীর মানুষ নয়। সুতরাং তাদের জীবনের দামও শ্রেণী হিসেবে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

—বাঃ! মন্ত্রী, আপনি যথার্থই বলেছেন। ঠিক আমার মনের কথাটিই প্রকাশ করেছেন আপনি—।

আলোচনা আরও এগোচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আবার দূর-আলাপনযন্ত্র বেজে উঠল। মন্ত্রী লাফিয়ে গিয়ে সেটা ধরেন।

—হ্যালো ?

—আজ্ঞে, পাইন বলছি। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে! হোসপাইপের জল ছুঁড়েও কাজ কিছু হচ্ছে না। কাতারে-কাতারে মানুষ এগিয়ে আসছে! সবাই মিলে চাপ দিচ্ছে সিংহদ্বারের ওপর! সিংহদ্বার ভেঙে যেতে পারে!

—একটু ধরুন। রিসিভার নামিয়ে রেখে মন্ত্রী রাজাকে সব জানাতেই রাজার দুই চোখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। সিংহাসন ছেড়ে তিনি পায়চারি শুরু করেন। মুখে বিড়বিড় করছেন—এত স্পর্ধা ? এত বাড়-বাড়ি ?···তারপর একসময় পায়চারি থামিয়ে গম্ভীর গলায় ডাক দেন—মন্ত্রী···!

—মহারাজ ?

—গুলিবর্ষণের আদেশ দিন। দু-চারটে মৃতদেহ পড়লেই সব আন্দোলন থেমে যাবে ?

—যথা আজ্ঞা, মহারাজ—।

মন্ত্রী ফোন তুলে পাইনকে রাজার নির্দেশ জানিয়ে দেন।

*

বিকেল গড়িয়ে ধীরে-ধীরে নেমে এসেছে গাঢ় সন্ধ্যা। আলোর সাম্রাজ্য কখন যেন দখল করে নিয়েছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে পরপর গুলিবর্ষণের শব্দ। ··একবার··দুবার···তিনবার! উপর্যুপরি আরও অনেকবার! ···তারপর প্রবল ঝড় সহসা থেমে গেলে যেরকম নিথাদ নৈঃশব্দ্য নেমে আসে, সেরকম সব চুপচাপ···।

অনেকক্ষণ বাদে নৈঃশব্দ্যের গভীর থেকে রাজা ডাক দেন—মন্ত্রী—!

—মহারাজ ?

—কাজটা কি ঠিক হল ? অনেক মানুষ মরবে।

—আপনার নির্দেশ! তা তো ভুল হবার কথা নয়। এরকম উত্তরে রাজা খুশি হন। স্বস্তি বোধ করেন। তারপর আবার কিছুক্ষণ পর—

—মন্ত্রী!

—মহারাজ ?

—এখনও কিছু ভাবছেন মনে হয়।

—একটা কথা অবশ্য ভাবছি। যদি অভয় দেন তো বলি—।

—বলুন।

—প্রাসাদের সামনে তো অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকবে। তাদেরও পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপার আছে। মৃত মানুষেরা সকলেই যে একশ্রেণীর সেরকম নাও হতে পারে! আপনার নির্দেশ যা তাতে তো বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন রকম ক্ষতিপূরণ হবে। কিন্তু ব্যাপারটা তো সারা দেশের লোকই এবার জানবে। আন্দোলনটা যদি সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে যায়—তাহলে কী হবে? আমরা এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকব, না উন্নয়নে মন দেব ?

বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছেন এই ভেবে মন্ত্রীর আত্মতৃপ্তি হয়।

রাজা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর একটু হেসে বলেন—আপনার সব ভালো, মন্ত্রী। আপনি পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত, আইনের ব্যাখ্যা ভালো করতে পারেন। কিন্তু আপনার কূট বুদ্ধিটা একটু কম···।

মন্ত্রী আহত হন। কিন্তু মুখে কিছু বলা সম্ভব নয়। মনে-মনে বলেন—সেটা যদি আরো একটু বেশি থাকত মন্ত্রী থাকতাম কি এতদিন? রাজাই হয়ে যেতাম হয়তো। বহুদিনের সাধ আমার রাজা হবার। আমার অর্ধাঙ্গিনীর সাধ আবার আমার থেকে অনেক বেশি।

মন্ত্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে রাজাই আবার শুরু করলেন—এই সহজ ব্যাপারটা নিয়ে এত মাথা ঘামাতে হচ্ছে? এতক্ষণে নিশ্চয়ই মিছিল ভেঙে গেছে। মৃতদের ফেলে রেখে গা-ঢাকা দিয়েছে সবাই। নিজের প্রাণের থেকে কি আর আন্দোলন বড়ো? এখন সারা রাত ধরে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—ওই মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলা গোপন জায়গায়। যাতে কেউ কোনোদিন না ওদের হদিশ পায়। এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে লোকগুলো! কী, পারবেন না সেই ব্যবস্থা করতে?

—পারব মহারাজ।

—আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার?

—আজ্ঞে, না মহারাজ। তবে—

—বাকিটাও বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। জীবন্ত মানুষের দাম তো হয়ই—হয় না?

—নিশ্চয়ই, মহারাজ!

—মৃত মানুষের দামও হয়। ক্ষতিপূরণ বলতে তো এটাই বোঝায়? তাই না?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কিন্তু হারিয়ে গেছে যে মানুষগুলো তাদের দাম আপনি ধার্য করবেন কিভাবে? কিসের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেবেন?

—রাজা থামেন। মন্ত্রী চুপ।

—সুতরাং যে মানুষগুলোর আর কোনো চিহ্নই নেই,—তাদের ব্যাপারে কিভাবে আন্দোলন হবে? এবার বুঝেছেন ব্যাপারটা? রাজা জিজ্ঞেস করেন।

—বুঝেছি মহারাজ। সেইসঙ্গে এটাও বুঝলাম।

—কী?

—যে,—আপনার তুলনা একমাত্র আপনিই···।

জীবন থেকে নেয়া

আজহারউদ্দীন খান্

জীবনীর সঙ্গে আত্মজীবনীর তফাত হচ্ছে জীবনী প্রধানত ঘটনা-নির্ভর, সেজন্য ঘটনা জোগাড়ের ওপর জীবনীকাররা জোর দিয়ে থাকেন; আর আত্মজীবনীতে ঘটনার মধ্যে আত্মোপলব্ধির অভিজ্ঞতা লেখক আশ্রয় করে থাকেন। জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্ত অংশকে বাদ দিয়ে জীবনের যে প্রকাশ, তাই আত্মজীবনীর প্রধান অঙ্গ। সেজন্য তিনি জীবনের ব্যাখ্যাকার। জীবনীকার ঘটনার সূত্র খোঁজার জন্য রোজনামচা, পত্রাবলী, এমনকী লেখকের আত্মজীবনীকেও গ্রহণ করে থাকেন—সব ঘটনাকে জুড়ে-জুড়ে ক্রমানুসারে জীবনী তৈরি করে থাকেন। আর আত্মকথা ঘটনার ভার কমিয়ে নিজের চেতনার জাগরণ তথা বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠার কাহিনী আত্মজীবনীকার বলে থাকেন। আত্মজীবনী রচনার আদর্শ সম্পর্কে গ্যেটে বলেছেন, 'to exhibit the man in relation to the circumtances of his time and to show how far everything has opposed or forwarded his progress, what kind of a view of the world and of mankind he has formed from them and how he, if an artist, poet on writer may outwardly reflect them.' আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'আত্মস্মৃতি'ও এই মানুষ হয়ে ওঠার কাহিনী যার মধ্যে ঘটনাকে উপলক্ষ করে জীবনের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। জীবন দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন তিনি।

আবু জাফর শামসুদ্দীন আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ১৯১১ সালের মার্চ মাসের কোনো এক তারিখে ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ থানার দক্ষিণবাগ গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন। ১৯৮৮, ২৪শে অগস্টে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সাতাত্তর বছরের জীবনে তিনি গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ জীবনী প্রচুর লিখেছেন। বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজে তিনি নিজের স্থান করে নিয়েছেন। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি দেশ এবং সমাজের উত্থানপতনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, বিভাগপূর্ব বঙ্গদেশের নানাবিধ আন্দোলনের শরিক ছিলেন, নিজের জীবনকালেই দেশভাগ, পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা—সবকিছু তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছে। দেশের সুখে-দুঃখে নিজেকেও ভাগীদার করেছিলেন বলেই তাঁরা আত্মস্মৃতি আমাদের ঔৎসুক্য জাগায়, কিভাবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে দেখেছেন সেটিও জানতে কৌতূহল হয়। তাঁর আত্মস্মৃতি একাধারে সাহিত্য এবং অনতিদূর অতীত ঘটনাবলীর সাক্ষ্য। সেজন্য বইয়ের একটি ছোটো ভূমিকায় শওকত ওসমান যা বলেছেন তাতে আমার সায় আছে। তিনি বলেছেন, নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের কাছে আত্মস্মৃতি পথের হদিশ দিতে পারে এবং রচয়িতা কালের ইমাম হতে পারেন। তাঁর একথায় আমার কেন সায় আছে, সে কথায় এবার আসছি।

ঘটনার বৈচিত্র্য আর সমারোহ সব মানুষের জীবনে কিছু না কিছু থাকেই। শামসুদ্দীন সাহেবের জীবনেও তা আছে, কিন্তু এটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হচ্ছে ঝাড়াই-বাছাই করে জীবনের তাৎপর্যকে

আত্মস্মৃতি (প্রথম খণ্ড)—আবু জাফর শামসুদ্দীন। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা। [বাংলাদেশী মুদ্রায়]।

তুলে ধরাই লেখকের কাজ। জাফরভাই এই কাজ বেশ ভালোভাবেই নির্বাহ করেছেন।

আত্মস্মৃতির গোড়াতেই তিনি খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'সেদিন জীবনের উষালগ্নে কুঁড়ির কোল ছেড়ে যখন সংসারের কোলে স্থান করে নিয়েছিলাম তখনকার দৃষ্টি এবং আজকের দৃষ্টি তো এক নয়। চোখ দুটো যথাস্থানে ঠিক ঠিক আছে। কিন্তু সেদিন যে দৃষ্টিতে চারদিকের সবকিছু দেখেছি, ইচ্ছে থাকলেও, আজ সে দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নয়। পরিবেশ বদলে গেছে। ...সেদিন আমি যে মানুষটি ছিলাম আজ আর সে মানুষটি নেই। ...যে ঘটনা এইমাত্র ঘটল, পরমুহূর্তেও তার অবিকল বর্ণনা দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আজ যে স্মৃতিচারণ করছি তার মধ্যে সেকালের সঙ্গে একাল মিশে যাওয়াই স্বাভাবিক। স্মৃতিশক্তিও ঠিক ধারাবাহিকভাবে পুনর্জাগরিত করা যায় না। তাই আগের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনা আগে এসে গেছে। তখন যা কিছু দেখেছি মনে হয়েছে কি সুন্দর! কি অভিনব! কি অপূর্ব! কি বিস্ময়কর! আজ সুন্দরের পাশাপাশি অসুন্দরকেও দেখতে পাচ্ছি, আনন্দের পাশাপাশি নিরানন্দ। তখনকার বহু সত্য আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। একই জীবনে এই যে দৃষ্টি, চিন্তা, অনুভূতি এবং পরিবেশের পার্থক্য তার ছাপ স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে স্মৃতিচারণের মধ্যে।' (পৃ১) সেজন্য ঘটনার গাদাগাদি নয়, অনুভূতির আলোকস্পর্শে তাঁর আত্মস্মৃতি প্রজ্বলিত।

আত্মস্মৃতির তিনটি অধ্যায়—আমার পাঠশালার দিনগুলি (১-১২২), বৃহত্তর ভারতে (১২৩-২৩২), পাকিস্তানে (২৩৩-৪১০)।

বাপঠাকুরদার আর্থিক আর সামাজিক প্রতিপত্তি, বিদ্যাচর্চা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গ্রাম্য পরিবেশ, জাতপাত, খানাপিনা, লোকজনের জীবিকা, হাটবাজার, দরদাম ইত্যাদি বিষয়গুলি লেখক বেশ গুছিয়ে রসিয়ে বলেছেন, কোথাও ক্লান্তিকর বলে মনে হয় না—উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কর্মব্যপদেশে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে, থাকতে হয়েছে, কিন্তু জন্মভূমির গ্রামটি তাঁকে চিরদিন ব্যাকুল করেছে। গ্রামের প্রতিজনের কথা প্রায় প্রতি মুহূর্তে স্মৃতির দুয়ারে হানা দেয়, পরিণত বয়সে তাদের কথা স্মরণ করে তাঁর মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। এমন এক চরিত্র তাঁর ছোটোবেলার শিক্ষক যিনি গ্রামের মধ্যে প্রথম ম্যাট্রিকুলেট ছিলেন, পরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় লুঠপাটের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। সাধারণ খেটে-খাওয়া পরিবারের যিনি সন্তান ছিলেন, তিনি নিপীড়িত জনগণের বন্ধু না হয়ে শত্রু হয়ে গেলেন, শিক্ষক হিসেবে যাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং এখনও করে থাকেন কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-চরিত্র তাঁকে ব্যথা দিয়েছে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাতাবরণে মানুষকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করতে পারে নি। সব চরিত্রই যে তাঁর মনকে তিক্ত করেছে তা নয়, মরুভূমির উষরতার মধ্যে মরূদ্যানও তিনি পেয়েছেন বলে সিনিক তিনি হন নি, বরাবর আশাবাদী রয়েছেন।

গ্রামে জাতপাতের কড়াকড়ি যেমন ছিল, তেমনি তার মধ্যে মনুষ্যত্বও ছিল। কালীমোহন ভট্টাচার্য গোঁড়া হলেও জাতিধর্মনির্বিশেষে দুঃখী মানুষের দরদি বন্ধু ছিলেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, যদিও সাধারণ মানুষের প্রতি ছুঁই-ছুইভাব ছিল, নীচুতলার লোক চৌকিদার হলেও চটিজুতো পরেছিল বলে রামকুমার মণ্ডলকে বর্ণহিন্দুসমাজ জুতোপেটা করেছিল। হিন্দু-মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় পরস্পরের নীচু সম্প্রদায়কে অবজ্ঞার চোখে দেখত, অথচ উঁচুতলায় দুই অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে নাকসিটকানো মনোভাব ছিল না। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয় নি। এমনকী মুসলমান তালুকদার খাজনা আদায় করতে গিয়ে হিন্দুর দ্বারা আক্রান্ত

হয়েছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নি, ওরকম চিন্তা কারুরই মাথায় গজায় নি। জমি সংক্রান্ত দাঙ্গা আর মামলায় হিন্দুর পক্ষে মুসলমান লাঠিয়াল সাক্ষীসাবুদ পাওয়া যেত, অনুরূপভাবে মুসলমান-পক্ষে হিন্দু লাঠিয়াল সাক্ষী পাওয়া যেত। ব্রাহ্মণ যুবক এক মুসলমান চাষির যুবতী পত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে, ধর্মান্তরিত হয়ে, তাকে বিয়ে করে। শেষে সেই স্ত্রী বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতে থাকে, এবং এক দিনমজুর যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়, আর সেই যুবকও পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে স্বস্থানে ফিরে যায়। এরকম ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি, অথচ দেশভাগের সঙ্গে-সঙ্গে কত তুচ্ছ কারণে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত গ্রামে হিন্দুসম্প্রদায় ছিলেন, তারপর জমিজমা ভিটেমাটি বিক্রি করে দেশত্যাগ করেছেন। লেখকের পরিচিত জনদের মধ্যে মাত্র একজনই ভিটের মায়া কাটাতে পারেন নি, ওখানেই দেহ রেখেছেন। এঁকে নিয়েই লেখক "রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা" গল্প রচনা করেছিলেন। গভীর মর্মবেদনা থেকে শুধু গল্পের জন্ম হয় নি, সঙ্গত-রূপে তাঁর মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জেগেছিল নির্দ্বিধায় তিনি আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন—'জীবন-সায়াহ্নে এসে আজ যখন ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক হানাহানি খুনোখুনি, অকালে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা স্মরণ করি তখন নিজের প্রশ্ন জাগে, তৎকালীন নিখিল ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতারা কি সজ্ঞানে ক্রিমিনাল ছিলেন?' (পৃ২২-২৩) দেশভাগজনিত নিহত মানুষের বেদনা তাঁকে সারাক্ষণ ঘিরে রয়েছে এবং এই প্রশ্ন আর প্রসঙ্গ বারবার তাঁকে বিহ্বল করে তুলেছে। যেমন—

'শতশত বছরের বাস্তুভিটা শ্মশান গোরস্থান ত্যাগ করতে হল এপার বাংলা ওপার বাংলার মানুষকে? কেন অকালে প্রাণ দিতে হলো অগণিত নরনারীকে? যারা হত্যা করল তারাও মানুষ ছিল। যারা নিহত হলো তারাও ছিল মানুষ। যারা প্রাণ হারাল তারা সকল লাভ-লোকশানের বাইরে চলে গেল। যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভিনদেশে ঘর বাঁধল তারাও কি সত্যসত্যই কিছু পেয়েছে? তার ছিঁড়ে গেলে একতারা দোতারা কোনোটাই বাজে না।' (পৃ৮৩-৮৪)

'বিভক্ত দেশের তিনটি রাষ্ট্রের কোথাও সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় নি। মূল মানবিক সমস্যা দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা সেকালে যেমন ছিল এখনও প্রায় সে-জায়গাতেই আছে।' (পৃ১১৭)

এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়-কেই দায়ী করেছেন তিনি। কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, সংখ্যালঘু এবং শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে উদার মানবিক আচরণ দ্বারা অভিন্ন ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব সংখ্যাগুরু এবং শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হিন্দু সমাজ পালন করে নি। এই যে সজ্ঞান উপেক্ষা, তার সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশরাজের খয়েরখাঁ মুসলিম সমাজের শিক্ষিত জমিদার তালুকদার শ্রেণী। হিন্দুরা মুসলমান-দের সংস্রব যথাসম্ভব বর্জন করে চলেছে। মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থ সমাজের বুকে বসে ছুরি মেরেছে। তার পরিণামফল ভারতবিভাগ।' (পৃ১১৭) দেশবিভাগ হল, পূর্ব পাকিস্তান বাংলা-দেশ রূপান্তরিত হল, ভারতবর্ষে স্বাধীনতার বয়স ৪৩ বছর হল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শেষ হয় নি, সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই। পরিণামে লাভ হয়েছে উপরতলার লোকদের। স্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়ে জাফরভাই যা বলেছেন তাতে আমাদের মাথা লজ্জায় অবনত হয়ে আসে, 'ইংরেজ এ-দেশ ছেড়ে গেল, কিন্তু জনসাধারণের সাথে এমন শত্রুতা করে গেল যে তার মাশুল পুরুষ-পুরুষানুক্রমে দিতে হবে। দেশের মূর্খ জনসাধারণ, অদূরদর্শী মধ্যবিত্ত সমাজ

গণবিরোধী নেতাদের মিথ্যা শ্লোগানে নেচে উঠল। আজ তারই ফল ভোগ করছে তারা। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কোন্ মূর্খ বলে দেশ স্বাধীন হয়েছে? মানবতার শত্রু সভ্যতার শত্রু সকল সাধারণ মানুষের শত্রুরা রাজত্ব করছে আফিমের নেশায় বুঁদ করে জনসাধারণকে, দেশের উপর।' (পৃ ৩৮২-৩৮৩)।

আত্মস্মৃতির মধ্যে সামান্য ঘটনাও অসামান্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণ একটি দিচ্ছি। সৈয়দ আলী আহসানের বাড়িতে সভা। সভায় আলোচ্য বিষয় "পাকিস্তান ও ইসলামী রাষ্ট্র"। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় অনুষ্ঠান। লেখকের যেতে দেরি হয়েছে। গুলিস্তানে বাস থেকে নেমে হন্তে হয়ে হাঁটছেন। এবার লেখকের জবানিতে ঘটনাটি শুনুন—'বাধা পেলাম, একটা পাঁচ ছ বছরের ছেলে সমুখে দাঁড়াল তার হাতে বাসী বেত-ফুলের ছোট দুটি মালা। পর্যুদস্ত মালার শ্রী। কিনলাম না। কিছু দূরে গিয়ে মনে হলো একটা পাপ করলাম। হয়তো মা বিধবা নিরবলম্বন। ভিক্ষা না করে মালার বিনিময়ে কিছু পয়সা চাচ্ছে। বক্তৃতা হলো। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলাম। কিন্তু বাসায় ফেরার পরও মালা না কেনার অনুশোচনার দগ্ধ হতে লাগলাম। পাকিস্তান ও ইসলামিক রাষ্ট্রশীর্ষক বক্তৃতার মূল্য কি মালা দুটির চেয়ে বেশি মূল্যবান? এ প্রশ্ন জাগল মনে, বক্তৃতার কথা ভুলে গেছি। কিন্তু ক্ষুধার্ত ওই বালকের হাতের মালা দুটির কথা কখনও ভোলার নয়। (পৃ ৩৭৭) এরকম হৃদয়মোচড়ানো অনুভূতি তাঁর আত্মস্মৃতির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যেমন ছেলেকে সামান্য খেলনা অর্থাভাবের জন্য কিনে দিতে পারেন নি, খেলনা কিনে দিলে সেদিন উপোস করে থাকতে হয়। অসহায় পিতার অব্যক্ত বেদনা ভোলার নয়।

গ্রামের জীবন শেষ করে যখন শহরে পড়তে এলেন তখন তাঁর "বৃহত্তর ভারতে" অধ্যায় শুরু হয়েছে। পূর্ববঙ্গের ছেলে গ্রাম থেকে সোজাসুজি কলকাতায় এসে পড়াশুনা করার আর্থিক সামর্থ্য তাঁর ছিল না। ঢাকাতে এসে লোকের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। পড়াশুনা শেষ করে কলকাতায় এলেন চাকরির সন্ধানে। নানা ধরনের চাকরি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। কলকাতায় থাকতে-থাকতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমাতঙ্ক, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ১৬ই অগস্টের দাঙ্গা, দেশভাগ দেখলেন। দেশভাগের পর ঢাকায় চলে এলেন আর ওখানেই তাঁর মৃত্যু হল। কলকাতায় সঙ্গে তাঁর যোগ কমে গেল। এমনিতেই কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর আলগা হয়ে আসছিল। ১৯৪৫ সালে ঢাকায় আজাদের শাখা অফিস স্থাপনের জন্য তাঁকে বেশিরভাগ সময় ঢাকাতেই থাকতে হয়েছিল। তারপরই পাকিস্তান অধ্যায় শুরু হয়েছে। তাঁর দেখা পুরোনো দিনের ঢাকার পরিচয়ও আমাদের চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে যায়। সেই সস্তাগণ্ডার দিন যদি ফিরে আসত তবে কেমন হত—বর্তমান প্রজন্ম নিতান্তই কল্পকথা বলে ভাবতে পারে। ১৯৩২-৩৩ সালে মোটা চালের মন ছিল দু টাকা, বালাম চালের মন ছিল চার টাকা, চিনির সের ছিল ছ পয়সা, গো-মাংসের সের ছিল দু আনা, ছাগলমাংসের সের ছিল তিন আনা, সোনার ভরি ছিল উনিশ টাকা। ঢাকায় পড়তে এসে লোকের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতে গিয়ে মুসলিম সমাজজীবনের রকমারি চিত্র যা দেখেছেন সেটিও আত্মস্মৃতির মধ্যে তুলে ধরেছেন। দরিদ্র মুসলমানের মধ্যে হৃদয়ের পরিচয় তিনি পেয়েছেন—তাদের সামর্থ্য থাক বা না থাক, আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছেন।

কলকাতার ছাত্রজীবনে এবং কর্মজীবনে মুসলিম-সম্পাদিত প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। কিছু-কিছু কাগজে তিনি কিছুদিনের জন্য কাজও করেছেন। ফলে ওইসব পত্রিকার ভেতরের কথা তাঁর স্মৃতিকথার মাধ্যমে জানতে পারি। দৈনিক "ছোলতান", "মোহম্মদী", "আজাদ", "সওগাত" পত্রিকার পরিচয় কেউই দেন

নি। একটি নামকরা সাপ্তাহিক প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখে সাহিত্যসংখ্যা বের করে থাকেন। প্রতি বছর এক-একটি পরিকল্পনাকে রূপ দেন। এ বছর তাঁরা বাঙলা সাময়িকপত্রের পরিচয় ও ইতিহাস নিয়ে সাহিত্যসংখ্যা বের করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, "মোহম্মদী", "সওগাত", "বুলবুল" পত্রিকার পরিচয় দেওয়া হল না। প্রশ্ন জাগে, সেগুলি মুসলিম-সম্পাদিত বলে কি এই অনীহা, না, ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা? ওই পত্রিকাগুলিতে অনেক হিন্দু লেখকও লিখেছেন—যেমন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, মোহিতলাল মজুমদার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ এবং সাহিত্যের পালাবদলে উপরোক্ত পত্রিকাগুলির দানও কম নয়। সওগাতের সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেব আজও জীবিত—সওগাত বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর এনেছিল—তার গুরুত্ব "বিচিত্রা", "উত্তরা", "পূর্বাশা" থেকে কোনো অংশে কম নয়। আজ পর্যন্ত এপার বাঙলায় সাময়িক পত্রপত্রিকার যে বিবরণ বেরিয়েছে তাতে সযত্নে মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের পরিপোষকতায় মুসলিম-সম্পাদিত পত্রপত্রিকার দান যে কতখানি তা জানতে হয়েছে ওপার-বাঙলায় প্রকাশিত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এবং তৎকালীন লেখক ও সম্পাদকদের স্মৃতিচারণ থেকে। আবু জাফর শামসুদ্দীনের আলোচ্য স্মৃতিচারণ এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে পূরণ করেছে। যেমন আকরম খাঁর পত্রিকা বের করার প্রবণতা ও ভূমিকার কথা আমরা জানতে পারি। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী প্রতিষ্ঠিত দৈনিক "ছোলতানে"র সম্পাদক কবি আশরাফ আলী খানের রোমানটিক চরিত্র, প্রবল ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে নিজের জীবন কিভাবে তিনি শেষ করেছিলেন, জাফরভাই স্মৃতির ক্যামেরায় ধরে রেখেছিলেন বলেই আমরা জানতে পারলাম।

জাফরভাই যে প্রকৃতির ছিলেন তাতে রাজনীতি কোনোদিন তাঁর সমস্ত মন জুড়ে বসতে পারে নি, কুটনৈতিক রাজনীতি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়নি, তবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্বরূপ তিনি দেখেছেন। সেজন্যে এ গ্রন্থে যেমন সীমান্ত গান্ধী, মুজফ্‌ফর আহমদ, মানবেন্দ্রনাথ রায় আছেন, তেমনি আছেন ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওবর্দী, আবদুল হামিদ খান ভাসানীও। তবে ভাসানীর সঙ্গে জাফরভাইয়ের এক মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল; বিশেষ করে ভাসানীর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা জাফরভাইকে ভাসানীর প্রতি আকৃষ্ট করে-ছিল। ভাসানীর সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের সঙ্গী তিনি হয়েছিলেন—সঙ্গী হিসেবে ভাসানীকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার কথা তার স্মৃতিকথার এক উজ্জ্বল সম্পদ। স্মৃতিকথার আর-একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল আকরম খাঁ ও তাঁর পত্রিকা "মোহম্মদী", "আজাদ" পত্রিকার জন্ম-কাহিনী। দশ আনা পয়সা সম্বল করে যিনি কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্য-অন্বেষণে, শেষে কিভাবে লাখপতি হয়ে তোলেন তার চমকপ্রদ বর্ণনা আছে। দেশভাগের পর ঢাকায় এসে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সংগ্রাম করে তিনি যেভাবে কাগজ চালিয়েছেন তাতে আকরম খাঁর দক্ষ ব্যাবসা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

জাফরভাই ব্যক্তিবিশেষের যে চিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অঙ্কিত করেছেন তা সকলের মনঃপুত হবে, এমন কথা নয়। এক-একজন মানুষ এক-একজনের কাছে এক-একরকম। জাফরভাই আকরম খাঁর দক্ষতা দেখেছেন, ইংরেজি ভালো না জানলেও কোন্ শব্দ বসালে মনের ভাব ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারে, সেটি তিনি বলে দিতে পারতেন, ধনী হয়েও সরল জীবন যাপন করতেন—এরকম ঘরোয়া চিত্র যেমন আছে, তারই পাশাপাশি তিনি দেখিয়েছেন যারা আজাদ-মোহম্মদীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সারা-

জীবন দিয়েছে তাদের কর্মক্ষমতা লোপ পাবার সঙ্গে-সঙ্গে ছিবড়ের মতো ফেলে দিতে আকরম খাঁ কার্পণ্য করেন নি। জাফরভাইকেও এর শিকার হতে হয়েছিল। নিজের ছেলেদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা এমনই ছিল যে দোষী জেনেও প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং সুযোগ-মতো অভিযোগকারীর ওপর তার বদলা নিয়েছেন। জাফরভাই একবার তাঁর ছেলের সই জাল করার কাহিনী আকরম খাঁকে বলেছিলেন, আকরম খাঁ চুপ-চাপ শুনে গেলেন—কিছু বললেন না, একদিন সামান্য অজুহাতে জাফরভাইয়ের চাকরি খেয়ে নিলেন। মওলানা হয়েও তিনি শরীয়তবিরোধী কাজকারবার করতেন, দুর্নীতিতেও তিনি পিছপা হতেন না। আজাদের কথা বলতে গিয়ে আজাদ-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের কথাও এসেছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন মানুষ হিসেবে খাঁটি ছিলেন। তিনি আখের গোছান নি, তাঁর সহযোগী অনেকেই বাড়ি গাড়ি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু শামসুদ্দীন সাহেবকে যখন আকরম খাঁ সম্পাদকত্ব থেকে হটিয়ে দিলেন, তখন শামসুদ্দীন সাহেব কপর্দকহীন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন কাগজে কাজ করেছেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ও আবুল মনসুর আহমদ সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য আছে যা জাফরভাইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। শহীদুল্লাহ্ সাহেব সম্পর্কে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা যেভাবে বলেছেন (পৃ ৩৮৭-৩৮৮) তাতে বিতর্কের অবকাশ আছে। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের চাকরি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না আর কিছু একটার যুক্ত থাকলে অবসরপ্রাপ্ত মানুষ সচল থাকে। তাঁর বিদ্যাবত্তা আর সুনাম অনুযায়ী তিনি কোনোদিন তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান নি। জীবন-ধারণের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার পরও বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষতা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, বাংলা একাডেমীতে চাকরি ইত্যাদি তাঁকে করতে হয়েছে। এমনকী ছাত্রের অধীনেও কাজ করেছেন। তাঁর ছাত্র সৈয়দ আলী আহসান যখন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক, তখন তাঁর অধীনে একাডেমীতে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ইসলামি বিশ্বকোষ সম্পাদনার কাজ করেছেন। সবকিছু তিনি মুখ বুজে সহ্য করেছেন—কোনো কাজকে ছোটো বলে মনে করেন নি, যে কাজের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা থাকে সেই কাজ তিনি করেছেন। কাজেই হালালের রুজির পারিশ্রমিক যদি সঠিকভাবে না পান তাহলে ক্ষিপ্ত হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। জাফরভাই এই ঘটনার মধ্যে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অর্থলিপ্সার পরিচয় দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি যে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত হয়েও ছাত্রের অধীনে কাজ করাকে অসম্মান বলে মনে করেন নি, এদিকটা জাফরভাই কেন ভেবে দেখলেন না জানি না। আবুল মনসুর আহমদ সম্পর্কেও রাজনীতিগত মতপার্থক্যের কিছু-কিছু কথা আছে। আলোচ্য স্মৃতিকথার অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছে মনসুর সাহেবের "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" (১৯৬৮) "আত্মকথা" (১৯৭৮)। উক্ত বই দুটি আমার পড়া নেই, নইলে জাফরভাইয়ের বক্তব্য সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেত। এ বঙ্গে শহীদ সোহরাবর্দীর নাম এমনই কালিমালিপ্ত যে সোহরাওবর্দী নামের লোককে এপার-বাঙলায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না তৎকালীন ঘোষ মন্ত্রিসভা। সেজন্য শহীদের ভাই সাহেদকে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদ ত্যাগ করে পাকিস্তান চলে যেতে হয়। অথচ শহীদ সাহেব ব্যক্তিজীবনে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরিচারক ছিল হিন্দু। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা জাফরভাই স্মৃতিচিত্রে উল্লেখ করেছেন।

পাকিস্তান হবার পর পাকিস্তানি রাজনীতি, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতাদের কোন্দল দলাদলি থেকে উদ্ভূত সঙ্কট-সমস্যাদি এবং তার ফলে অস্থির সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী রাজ-

নীতি দেশের জনমানসের আশা--আকাঙ্ক্ষাকে গণ-আন্দোলনকে কিভাবে পর্যুদস্ত করেছে আর সেই সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল জারি করেছে, তার বর্ণনা আত্মস্মৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে ভাষা-আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলো যখন রাষ্ট্রভাষা বাঙলার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ নিজেদের প্রাণ দিতে বদ্ধপরিকর। মোটামুটিভাবে অবিভক্ত ও বিভক্ত বঙ্গদেশের বর্তমান শতকের জলন্ত অধ্যায়গুলি তাঁর স্মৃতির মধ্যে ধৃত হয়ে আছে।

জাফরভাইয়ের আত্মস্মৃতি সাধারণ মানুষের চোখে দেখা এক অসাধারণ গ্রন্থ যেটি সাহিত্য, রাজ-নীতি, ধর্ম ও সমাজের এক অসন্দিগ্ধ অভিজ্ঞান হিসেবেও গণ্য হবে। যদিও মাঝে-মাঝে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, ঘটনার খেই হারিয়েছে। কিছু কথা বলে আবার পূর্ব প্রসঙ্গের জের টানা হয়েছে, কথা শেষ হতে না হতেই আর-এক কথা এসেছে। কিন্তু লেখা সহজ সরল ক্ষুরধার তীব্রগতিসম্পন্ন হবার দরুন পড়ার সময় ওইসব ত্রুটি মনকে কাঁটার মতো বেঁধে না, তবে বইটির মুদ্রণপ্রমাদ এত বেশি যে বারে-বারে হোঁচট খেতে হয়। যত্ন নিয়ে প্রুফ দেখা হয় নি। একই বস্তু ভুলবশত দুবার মুদ্রিত হয়েছে, যেমন ৩৪৭-৩৪৮ পৃষ্ঠা, বাঁধাইও খুব একটা ভালো নয়। লেখকের জীবৎকালে বইটি বেরোয় নি। তাঁর পুত্র আহমদ পরভেজ শামসুদ্দীন বের করেছেন ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সালে। পুত্রকে ধন্যবাদ, প্রয়াত পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন যা কেউ সাধারণত করে না। আত্মস্মৃতির প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৬৮ সালে এসে। বাংলাদেশ হতে তখন বাকি মাত্র তিন বছর। পরবর্তী খণ্ডে সেই রোমাঞ্চকর সংগ্রামের ইতিহাস পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছি, কারণ তাঁর রচনার সরল স্নিগ্ধ মনীষা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, আর যাঁরা পড়বেন তাঁরাও তৃপ্তি পাবেন॥

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে', হে বাংলাদেশ

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? আমরা এপার-বাঙলার সাধারণ মানুষ, যারা বিশেষজ্ঞ নই, খবরকাগজে মাঝে-মাঝে বাংলাদেশের টুকরোটাকরা খবর পড়া অব্দি যাদের দৌড়? কিছু বছর অন্তর সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে এক স্বৈরাচারী সিংহাসন দখল করে, আর হামেশা ভয়ংকর সাইক্লোনে সমুদ্রপ্লাবনে দেশটা ছত্রখান হয়ে যায়, লাখ-লাখ মানুষ মরে, সেইসব মানুষ যারা জনসংখ্যার অধিকাংশ আর যাদের জীবনমান পশুরও অধম—বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের বৈপ্লবিক উত্তেজনা ক্ষীয়মাণ হয়ে এলে এখন তো আমরা ওই দেশ সম্বন্ধে এইটুকু জানি। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি এরশাদ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ঐসলামিক রাষ্ট্র হিশেবে ঘোষণা করার পর এপার-বাঙলায় তথা ভারতে শুধু বুদ্ধিজীবী-মহলেই নয়, জনসাধারণ্যেও হইচই হল। এ ঘটনার আগে থেকেই কোনো-কোনো মহল থেকে প্রচার চালানো হচ্ছিল যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমান বিপন্ন। মুসলমানরা হিন্দুদের বেধড়ক পেটাচ্ছে, তাদের রুজিরোজগার বন্ধ করে দিয়েছে, ঐসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুদের ঠাঁই নেই। ভারতের ঘোষিত হিন্দুবাদী দল ও সংগঠনগুলো এবং ছদ্ম হিন্দুবাদী সংস্থা, সংবাদপত্র বা সাংবাদিকমহল বাংলাদেশে হিন্দু-নিগীড়নের বিরুদ্ধে দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে "বাংলাদেশ। বাংলাদেশ !!" বইটির প্রকাশ এপার-বাঙলার জাতিধর্মনির্বিশেষ

বাংলাদেশ! বাংলাদেশ !!—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সমতট প্রকাশনী, ১৭২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ডিসেম্বর ১৯৮৯। পনেরো টাকা।

জনসাধারণের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, ভ্রান্ত ধারণা, মনগড়া কাহিনীর প্ররোচনায় বিক্ষুব্ধ মানসিকতা ঘুচিয়ে সত্যিকারের বাংলাদেশের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে এই বইটি এক বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সত্যিকারের মর্মের সংবাদ জানিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে লেখালেখি যে হয়নি তা নয়, কিন্তু এই বইটি হাতে পেয়ে এবং পড়ে ওঠার পর মনে হল, তাই তো, এরকম একটি গ্রন্থ তো আমাদের ভাঁড়ারে ছিল না।

বইটির লেখক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী কর্মী। পূর্বসংস্কাররহিত স্বচ্ছ মনে তিনি সত্যানুসন্ধানে প্রয়াসী। আর পাঁচজন পশ্চিমবঙ্গবাসীর মতো বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তিনিও একদা অনবহিত, অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ১৯৮৭ সালের ১৯শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত তিনি নোয়াখালির গান্ধী আশ্রমের আমন্ত্রণে আর ব্যবস্থাপনায় ওদেশ দেখার সুযোগ পান। প্রাণশক্তিতে ভরপুর মুক্তবুদ্ধির এক নতুন জাতির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তথা প্রত্যক্ষ সংবেদন নিয়ে নানা পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এপার-বাঙলার সকলকে তাঁর আনন্দবেদনা আশা-হতাশার অংশীদার করে তোলার মানসে যখন নিবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে বেরুচ্ছিল, তা গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৬ সালের অকটোবর মাসে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে শান্তির বাণী নিয়ে মহাত্মা গান্ধী যখন গিয়েছিলেন, তাঁর চেতনার রঙে রাঙানো কিছু মানুষ সেখানের গ্রামে-গ্রামে গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, আজও তার কয়েকটি পাকিস্তানি আমলের চরম বর্বরতা সহ্য করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় টিকে আছে এবং কাজ করে চলেছে। এই সংস্থাগুলি দেখতে এবং এখন কারা বাংলাদেশে গান্ধীবাদী গঠনমূলক কাজকর্ম কতটা আর কী প্রকারে চালিয়ে যাচ্ছেন তার খোঁজ নিতে গিয়ে শৈলেনবাবু আরো অনেক কিছু দেখে এসেছেন, জেনে এসেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ আর পর্যালোচনার একটি মূল দিক হল সাম্প্রদায়িকতা। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ তথা হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মিলন-বিভেদের চরিত্রনির্ণয়ে তিনি চেষ্টা করেছেন এবং মনোরম হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও শৈলীতে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখেছেন।

বইটিতে মোট নটি নিবন্ধ রয়েছে। "বাংলাদেশের হৃদয় হতে" এবং "বাংলাদেশ ! বাংলাদেশ !!" নিবন্ধ দুটি বাংলাদেশের জন্মের কিছুদিন পরে লেখা। প্রথমোক্ত নিবন্ধটিতে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস বিবৃত। পাকিস্তানরাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং কোন্ ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভাবে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম, লেখক তা ঐতিহাসিকের মতো বর্ণনা করেছেন। ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের চেয়েও মানুষের মধ্যে যে আরো অনেক বড়ো ঐক্যের আদর্শ আর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে —কোনো জনগোষ্ঠী বা শ্রেণীর দ্বারা অন্য জনগোষ্ঠী বা শ্রেণীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণমুক্তি এবং ঐতিহাসিকভাবে লব্ধ ভাষা ও সংস্কৃতির নির্বাধ চর্চা ও বিকাশ—যার জোরে ধর্মের জিগির উপেক্ষা করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে, হয়েছে—এই মূলসূত্রটি লেখক এই নিবন্ধে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নামপ্রবন্ধটিতে "বাংলাদেশ : এ লিগাসি অব ব্লাড"—এই বিখ্যাত বইটি অবলম্বনে শৈলেশবাবু ওদেশের ঘন-ঘন রক্তাক্ত রাজনৈতিক পালাবদলের বেদনাদায়ক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, যার প্রধান অংশ মুজিবের পতন এবং নিধন। স্বাধীনরাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে মুজিবের অদূরদর্শিতা, ক্ষমতালোলুপতা আর ক্ষমতার নোংরা রাজনীতি, বড়ো-বড়ো অন্তঃসারহীন প্রতিশ্রুতি দান ও জনগণকে

বঞ্চনা, জনগণের শত্রুদের আশ্রয়দান ও দমনে অনিচ্ছা এবং পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধের দুই বীর সৈনিকের চেষ্টায় মুজিবহত্যা।

এই ঘটনার পর বাংলাদেশে আর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নি। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন : 'বাংলাদেশের পরবর্তী কালের রক্তস্নানের মূলে রয়েছে তার সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ (এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপও) অস্ত্রবলের যে শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করে পরবর্তী কালে পদে-পদে তার প্রমুখতা দৃষ্টিগোচর হয়। চেতনা-সম্পন্ন ও সংগঠিত জনশক্তির সহায়তায় (যা স্বভাবতই নিরস্ত্র হতে বাধ্য) নয়, অস্ত্রের বলে যদি সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রথা একবার স্বীকৃতি পায়, তারপর দীর্ঘকাল যে কোনো ব্যবস্থা পরিবর্তনকামী, নিজ উদ্দেশ্যপূর্তির জন্য ঐ অস্ত্রশক্তিরই সহায়তা নিতে প্রলুব্ধ হন। এর পরিণামে শেষ অবধি যে শক্তি বিজয়ী হয়, তা হল অস্ত্রশক্তি বা সামরিক বাহিনী।'

"নোয়াখালিতে মহাত্মার পদচিহ্ন ধরে" এবং "কিছু গঠনকর্ম প্রতিষ্ঠান" নিবন্ধ দুটিতে রয়েছে গান্ধীবাদী গ্রামীণ কুটিরশিল্পসংগঠনগুলির এবং আশ্রমকর্মীদের সংগ্রামী জীবনের বিবরণ। রেডডীপল্লি সত্যনারায়ণ নামের বিশাখাপত্তনমবাসী এক তেলুগু মহাত্মার আহ্বানে ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে দুর্গত বাঙালির সেবার জন্য তাঁর স্বরাজ্যের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করে চিরকালের জন্য নোয়াখালির পানিয়ালা বাজারে চলে এসে গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন—এই ঘটনা জেনে রোমাঞ্চ হয়। "জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়" এবং "বাঙালি জাতীয়তাবাদ" নিবন্ধ দুটিতে কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ জন্ম নিল এবং বিকাশ আর প্রতিষ্ঠা লাভ করল, তার পর্যালোচনা। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সত্তার বৃদ্ধির ইতিহাস জানতে এই নিবন্ধ দুটি খুব সাহায্য করবে। বাংলাদেশ তথা ওই ভূখণ্ডের বাঙালিজাতির সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক ওতপ্রোত। এই সম্পর্কের মর্মার্থ এবং গতিপ্রকৃতি বিষয়ে এপার-বাঙলায় তথা ভারতে আমাদের কৌতূহলের সীমা নেই। "বাংলাদেশ ও ইসলাম" নামের বড়ো নিবন্ধটিতে শৈলেশবাবু বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের কৌতূহল নিরসনে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর নিবন্ধের বিস্তার অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত।

১৯৭৩ সালে লেখক ভেবেছিলেন : 'আওয়ামী লীগ আর তার নেতৃবৃন্দ এবং প্রগতিশীল ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যুক্তিবাদের সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করলেও বাংলাদেশের আপামর মুসলমান জনসাধারণ যে ইতিমধ্যে এতদিনের পরিবেশিত বিষের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছেন বা পারবেন, এতটা উচ্চাশা পোষণ করার কোনো কারণ নেই। কারণ এ ব্যাধি এত সহজে যায় না, এর জন্য দীর্ঘ অনুশীলন করতে হয়।.....জনসাধারণের মনের থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য বাংলাদেশের নেতৃত্বকে এখনো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এবং যতদিন না সেই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছান যাচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুরা যে বিচ্ছিন্নভাবে বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হবেন তার আশঙ্কা আছে।'
(বাংলাদেশের হৃদয় হতে)

এবার লক্ষ করা যাক ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ দেখে আসার পর তাঁর প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাসঞ্জাত মন্তব্যগুলি :

'বাংলাদেশের দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তা হল সাম্প্রদায়িকতার প্রায় নির্বাসন।' 'এখনো আমাদের দেশে থেকে-থেকে লজ্জাজনক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু-নিপীড়নের ঘটনা ঘটে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার কমতি নেই। মাঝে-মাঝে আতঙ্ক হয় সব ধর্মের মৌলবাদ বুঝি এদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সামনে বাংলাদেশের

রেকর্ড যথার্থই গৌরবজনক। ১৯৬৪-র পর অর্থাৎ পাকিস্তানি আমলের পক্ষপাতযুক্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও সেদেশে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে নি।' 'চাকমারা ছাড়াও বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলে—খাস চট্টগ্রাম শহরেই অনেক বৌদ্ধ আছেন। তাঁদের কাউকে বাস্তুচ্যুত বা নিগৃহীত হতে হয় নি।' 'হিন্দু ছাত্রছাত্রী, সরকারী ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁদের কেউ ধর্মের কারণে নিগৃহীত হচ্ছেন বলে মনে করেন না।'

'বাংলাদেশে যা হয়েছে তাহল এই যে, মুসলমানদের মধ্যে একদিকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ব্যাপক স্ফীতি এবং অন্যদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের কারণে সাম্প্রদায়িকতা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।'

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে হিন্দুরা নিপীড়ন আর অবিচারের শিকার হচ্ছেন বলে যে প্রচার তোলা হয় তাকে লেখক সংখ্যালঘু মানসিকতার অন্যতম প্রতিক্রিয়া বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, 'এঁরা সম্ভবত হিন্দুদের অতীতের অস্বাভাবিক গৌরবের দিনের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করেন। হিন্দুদের সেই পুরাতন দিনের দাপট এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ আর্থিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করার মানসিকতা বাঙালিদের মধ্যে লীগ ও পাকিস্তানের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য অংশত দায়ী। কিন্তু সেই 'সুবর্ণ' অতীত আর ফিরবে না। সৌভাগ্যক্রমে এ যুগের হিন্দু তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সেই ভিত্তিহীন সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নেই। আর অধিকাংশ আধুনিক মুসলমান তরুণ-তরুণী, বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধিমুক্ত।' (জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়)

কিন্তু ব্যতিক্রম কি নেই?

মুজিবের বাঙালি অস্মিতা অর্থাৎ ভাষা-সংস্কৃতি-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পথ ছেড়ে ক্রমশ জিয়াউর রহমান কিভাবে ইসলামি অস্মিতা অর্থাৎ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পথ ধরলেন এবং এরশাদ যেভাবে তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে তা আরও পুষ্ট করেন—লেখক এই গভীর এবং বিতর্কিত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে পিছপা হন নি। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, এরশাদের আমলে বাংলাদেশে ইসলামের যথার্থ ভূমিকা কী? এবং উত্তর সন্ধান করেছেন। কুখ্যাত জামায়েতে ইসলামি এবং ইসলামি ছাত্রশিবিরের উদ্বেগজনক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ঘটনাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন যে বাঙালি অস্মিতার পানজা কষাকষি চলেছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে। তিনি দেখেছেন, 'বাংলাদেশের জনসমাজের সুবিপুল বৃহত্তম অংশ—বিশেষ করে এর অভিমত-সৃষ্টিকারী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতা ও ইসলামী মৌলবাদকে বাতিল করেছেন। এর বিরল ব্যতিক্রম যেমন সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদেশে থাকে, তা জেনেই একথা বলা হচ্ছে।'

(বাংলাদেশ ও ইসলাম)

এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ হল "বাংলাদেশের অর্থনীতি—কিছু প্রশ্ন'। এই নিবন্ধটিকে বাদ দিয়ে এই বইটিকে ভাবা যায় না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং স্বয়ম্ভরতা ভিন্ন একটি স্বাধীন জাতির সত্তার বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়, এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয়—এই নিবন্ধে লেখক নানা পরিসংখ্যান-সহযোগে সেই ভয়াবহ চিত্র পরিস্ফুট করেছেন। বাংলাদেশের আর্থব্যবস্থার একান্ত বিদেশনির্ভরতা, চূড়ান্ত রকম বেকারি, কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্পনার অভাব এবং এর বিপরীতে সামান্যসংখ্যক মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রাপদ্ধতির বিলাসিতা, কনজিউমারিজমের উৎকট প্রাবল্য দেশটার আর্থিক তথা রাজনৈতিক বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তুলেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকবলিত বর্তমান মডেল যথাশীঘ্র না বদলালে সমূহ সম্ভাবনা নিয়ে জন্মানো এই নতুন জাতিটির অকালমৃত্যু ঘটবে বলে লেখক আশঙ্কা করেছেন। বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাঁর শুভেচ্ছা ও শুভবোধ যখন ভালোবাসায় উদ্বেগে বেদনায় উছলে ওঠে, শামসুর রাহমানের কবিতা ভিন্ন তিনি তা প্রকাশের অন্য ভাষা খুঁজে পান না: 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা / তোমাকে পাওয়ার জন্যে / আর কতকাল ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়? / আর কতকাল দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?'

বইয়ের পরিশিষ্টে প্রবীণ গান্ধীবাদী সমাজকর্মী পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'পর্যালোচনা'-র সংযোজন বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বাংলাদেশের তামিম, কিন্তু প্রচ্ছদে লেখকের নাম নেই কেন? এ কী ধরনের ভুল? এপার-বাঙলার সর্বসাধারণের কাছে সত্যিকারের বাংলাদেশকে জানার লক্ষ্যে বইটি অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে উঠবে, এই আশা নিয়ে এমন একটি বই প্রকাশের জন্য সমতট প্রকাশনীকে সাধুবাদ জানাই।

"বাংলাদেশ বাংলাদেশ" প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্তার উদ্দেশে আহমদ শরীফ।

সুজনেষু,

আপনার প্রেরিত বই পেয়ে কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত। এ বই আকারে পুস্তিকা বটে, কিন্তু প্রকারে বিশিষ্ট আর গুরুত্বে ও সচ্ছতায় অনন্য।

প্রথমাংশে গান্ধী আশ্রমের, প্রবর্তক সঙ্ঘের, মহেশপ্রাঙ্গণের যে চিত্র আপনি স্বল্পকথায় অঙ্কিত করেছেন, তাতে গান্ধীপন্থী সেবাব্রতী নিষ্ঠ ধৈর্যশীল আদর্শবাদী মানুষের মহত্ত্ব নয়—উজ্জ্বল ও বিরল মনুষ্যত্বই অকৃত্রিম প্রভায় প্রকট হয়ে উঠেছে। এই এই মানবসেবী সাধারণ মনুষ্যগুলির তুলনায় আমার নিজেকে নিতান্ত প্রাণী বলেই যেন মনে হয়।

"জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়" থেকে অন্য সব রচনায় আপনি বিদেশী সজ্জনসুলভ সৌজন্য ও সহানুভূতি আশ্রিত হয়েছেন বেশি মাত্রায়। যেন 'দোষ হর গুণ ধর' নীতিই আপনাকে বেশি প্রভাবিত করেছে। ব্যক্তিক্রমও রয়েছে যেমন "বাংলাদেশের অর্থনীতি" - এখানে আপনার দৃষ্টি নির্মোহ-নির্মম। এ বইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল "বাংলাদেশ ও ইসলাম"—এখানে উদ্ধৃতিবহুল দলিল-যোগে আপনি বাংলাদেশের এ মুহূর্তের আধি-ব্যাধির, মানসিক ও ব্যবহারিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আলেখ্য সুনিপুণ এবং সার্থক ভাবে দিয়েছেন। বলিয়েছেন ঢাকার তথা বাংলাদেশের নির্মোহ মনস্বীদের দিয়ে। কারুর প্রতিবাদ করার, দ্বিমত পোষণ করার উপায় রাখেন নি—এই বাংলাদেশের বাস্তব সঙ্কট, সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চিত্র। আপনার দেখবার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বুঝবার শক্তি সূক্ষ্ম। আপনি সৌজন্যবশে আমাদের আঁধার দিক উল্লেখ করেন নি। মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামি আমাদের সমস্যা নয়, কারণ এঁরা আধুনিক প্রতীচ্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গুরুত্বচেতনাবিরহী। তাঁরা আজো ইসলামের উন্মেষযুগের মরুভূ আরবের pastoral economy-র যুগে মানসবিহারে মুগ্ধ। এ যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত যুগে ও জগতে মানুষ যে আন্তর্জাতিক নির্ভরতা-সহযোগিতা-সহিষ্ণুতা-সহাবস্থানবিমুখ হয়ে বাঁচতেই পারে না, তা জামায়াতিরা বোঝে না, তারা জানে কোরআন-হাদিস-নিষ্ঠায় রয়েছে সর্বকালিক, সর্বস্থানিক, সার্বজনিক সর্বপ্রকার মানবিক সঙ্কট-সমস্যার সমাধান। এমনকি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল ও মন জীবনে আবশ্যিক নয়। কাজেই এ তত্ত্ব এ-যুগে অচল বলেই ওদের আপাত শত্রুরে সাফল্য ও উপদ্রব তেমন জাতীয় ক্ষতির কারণ হবে না।

আমরা জানি কামে-প্রেমে, লাভে-লোভে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, স্নেহ-প্রীতি-সখ্যে দেশ-জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে কোথাও কখনো অনীহার বা আঁধার কারণ হয় নি। জাতিদ্বেষণা, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব,

শ্রেণীচেতনা মাত্রই অর্থ-সম্পদসম্পৃক্ত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত - দৃশ্যে বা অদৃশ্যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। সেজন্যেই দরিদ্র উনজনকে বা অধিজনকে লোকে শ্রেণীগতভাবে অবজ্ঞা করলেও কখনো হিংসা করে না, দুর্বল বলে অন্য নানা কারণে হুকুম-হুমকি-হামলা চালায় বটে। আপনি বাংলাদেশে ব্যক্তি-জীবনে মনস্বিতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা খুঁজেছেন এবং পেয়েছেন, তা বর্ণন করে আশাবাদী প্রীতিকামীদের আশ্বস্তও করেছেন, কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে বিদেশী-বিভাষী বিধর্মী-বিভাষীর প্রতি যে স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্যচেতনাজাত অবজ্ঞা সুপ্ত বা অব্যক্ত থাকে, তা-ই সময়ে-সময়ে কোনো একশ্রেণীর স্বার্থে ও নেতৃত্বে হুজুগে অভিব্যক্তি পায় দ্বেষে-দ্বন্দ্বে-দাঙ্গায়। এটি ব্যক্তিক জীবনে নয়, সুপ্ত থাকে গোষ্ঠী-চেতনায়। বাংলাদেশের রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক-মানসিক ও মননসঙ্কটের মূলে রয়েছে অনির্ণীত জাতিসত্তার সঙ্কট। আজো স্বাধীনতা-উত্তর তেতাল্লিশ বছর পরেও আমরা বাঙালি, না মুসলমান বাঙালি দ্বিধা-দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে কোনো স্থির ও স্থায়ী জাতীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। আত্মপরিচয়ের এ সঙ্কট আমাদের অনুভব-উপলব্ধির, মনন-চিন্তনের সব প্রয়াস বৃথা ও ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আমাদের দৈশিক, রাষ্ট্রিক কিংবা ভাষিক জাতিসত্তায় জাতি-চেতনায় স্বস্থ ও সুস্থ হতেই হবে এবং থাকতেই হবে।

রাষ্ট্র-ধর্ম-ইসলাম করে, সর্বক্ষণ আমরা যে মুসলিম তা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বব্যাপারে স্মরণ করে দিয়ে সরকার অধিজন মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্যচেতনা উদ্দীপ্ত রাখছে, আর অমুসলিমদের করে রাখছে অনাত্মীয় বিজাতি। ওরাও স্বদেশের মাটিকে নিজের, মানুষকে আপন, আত্মীয় ও স্বজাতি ভাবতে দ্বিধা করছে। এর ফলে একটা অতি আবশ্যিক ও জরুরি দৈশিক জাতীয়তা-বোধ গড়ে উঠছে না অধিবাসীদের মধ্যে। এর আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনীতিক পরিণাম কেবল দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, অবিশ্বাসের, অনাস্থার ভাব গভীর ও ব্যাপক এবং চিরন্তন করবে মাত্র। মার্কিন অর্থ- ও মদদ-নির্ভর আমাদের মুৎসুদ্দী সরকারগুলো এভাবেই আমাদের ধনে-মনে কাঙাল, অস্বস্থ ও অসুস্থ রাখছে।

গুণমুগ্ধ
আহমদ শরীফ

সত্তার মায়ারূপের সন্ধানে

সুজিৎ ঘোষ

'ব্রতকথা' তাপস ওঝার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাপসের কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত ও সংহত। সময়কে কবিতার মধ্যে ধরার প্রয়াসও কবিতাগুলির মধ্যে লক্ষ করা যাবে। কিন্তু সাময়িকতার প্রভাবে তাঁর কবিতা সোচ্চার নয়, যদিও দু একটি রচনায় কবির স্বৈর্য বিঘ্নিত দেখি। যেমন, 'একটি সাক্ষাৎকার' কবিতায়, যদিও সেখানে পট তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নিপীড়নের ওপর, তাই 'অরওয়ালের ভারত সাউ-এর / সঙ্গে দেখা হয়ে গেল / কবি বেঞ্জামিন মেলোয়েজ-এর।' 'বেঞ্জামিন উচ্ছ্বসিত : আপনি, ভারত? / ওঃ আপনি স্বাধীন, আপনি আমাদের আদর্শ।' তার পরে কবি তাপস হয়ে যান নিজেই ভারত, 'আর আমি ভারত, আমাকে মেরেছে / পেছন থেকে স্বাধীন ভারতের / স্বাধীনতর পুলিশের স্বাধীন-তম গুলি।' কবিতায় সত্তার যে মায়ারূপ প্রত্যাশিত, তা অবশ্যই এ-কবিতায় নেই, কিন্তু কবির অনুভবে অসহায়তা ও ব্যঙ্গের যে সুরটি ফুটে ওঠে তার এক সমকালীন সার্বিকতা স্বীকার করতেই হয়। এমন সময়চেতনা আরো অনেক কবিতায় লক্ষ করা যাবে, 'নিরন্ন ভোটারের মৃত্যু হলে / রাজনীতি-নেতা কাঁদে / কোথাও কোথাও / পুলিশের ঘেরাটোপে / বুলেটের ভয়ে দূরদর্শনেতে। / কাঁদে পৃথুল পুলিশ কাঁদে / থানা থেকে ঘরে ফিরে / দূর থেকে যখন দেখে সে / ছেলে তার চুরি করে পড়শীর ফুল।' মনে হয় শব্দের ওজন ও পরম্পরা সম্পর্কে কবির আরো সচেতনতা প্রয়োজন, যেমন 'দূরদর্শনেতে' শব্দে 'তে' বিভক্তি বাদ দিলেই কাম্য ছ মাত্রা কানে ধরা পড়বে, অথচ অর্থের সঙ্গতি বিনষ্ট হয় না অথবা 'দূর থেকে যখন দেখে সে' শব্দের ক্রমসজ্জা না হয়ে, 'দূর থেকে যখন সে দেখে' হলে ধ্বনির বিন্যাস আরো সুচারু হত। এরকম আরো কিছু শব্দবন্ধ চোখে পড়বে, যেমন, 'বিশ্ব তো ছোঁয়নি তোমাকে'। কিন্তু এই সাতচল্লিশটি কবিতার সংকলনে অনেকগুলি কবিতাই পাঠকের ভালো লাগবে : মনসা হে, অদ্ভুত সময়, হাজার গাছের সারি, বাস্তু সাপ, নীচে নামি ইত্যাদি বেশ কিছু কবিতা। কিছু কিছু পংক্তি ঘুরেফিরে স্মরণেও থেকে যেতে পারে, 'আর হঠাৎ ঝড়ের রাতে / নিদারুণ ভেঙে দিতে পারে / কিছু কিছু কায়েমী কুলায়।' (প্রতিবেশী) অথবা 'কবি, ক্লান্ত হলে তাকিয়ো নিজের দিকে / জেনে নিও আর কতদিন কবিতাকে পণ্য করা যাবে—'। তাপসের উচ্চারণের ভঙ্গিটি সহজ অথচ তার সঙ্গে ব্যঙ্গের মিশ্রণ বুদ্ধির যুযুৎসু খেলা হয়ে ওঠে নি।

উনত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে তমিজ চৌধুরীর "অন্তর্গত স্রোতের প্রতি" গ্রন্থটিতে। প্রথম কবিতাটিতে আমরা ব্যর্থতার বোধজাত এক বিষাদের সাক্ষাৎ পাই। এবং এক গভীর দুঃখবোধ তাঁর কবিতায় সংক্রমিত দেখি, 'ভেবে ভেবে দুঃখের আগুন খুঁটি একা / যে পথেই চলি বারবার দুঃখের সাথে দ্যাখা', অথচ দেখি কবির আহ্বান, 'কবির চুম্বনকে অস্বীকার কোরোনা নারী / যদি অবহেলায় প্রত্যাখ্যান কর / জানবে একটি ফুলের মৃত্যু ঘটালে তুমি / কবির অভিশাপে নারী কবে হয় নি ভস্ম?' পাঠকের মনে হতেই পারে কবির অভিশাপে কবে নারী ভস্ম হল, নাকি কাব্যের ইতিহাসে বিপরীতটিই বারে বারে ঘটেছে? কিন্তু এই দুঃখবোধের ভিতরে এক ধরনের দুঃখবিলাস লুকোচুরি খেলে, তাই কবি স্বতঃসিদ্ধের মতো বলে ওঠেন, 'ঈশ্বরের রাজ্যে আত্মহননের কোনো মার্জনা নেই।'—এই প্রত্যয় অবশ্যই সুস্থ, কিন্তু কাব্যিক প্রকাশে তা ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে না। এ-ধরনের ব্যঞ্জনাহীন বক্তব্যের সবল প্রকাশ আরও অনেক কবিতায় লক্ষ করা যাবে, যেমন, তুলে নেবো ঘাতকের লাশ, শাস্তি বৈঠক মানি না, কড়া নাড়ার শব্দ ইত্যাদি বেশকিছু রচনা। অথচ কবি হার্দ্য উচ্চারণে সক্ষম, যখন লেখেন, 'যে বৃক্ষ পারে না মাটি থেকে চুষে নিতে জল / তুমি ক্যানো মিছেমিছি / দুধের সরোবরে ভাসাবে তাকে / পরজীবী বৃক্ষের আস্ফালন ব্যর্থ করে দাও / ঈশ্বরের পৃথিবীতে নির্ভরতার কিছুমাত্র দাম নেই / আমার দিকে তাকাও / এই আমি সতেজ তরুণ / চোখের সবুজ নদীতে আমাকে হারাও।'—ভাবনার মধ্যে এই স্ববিরোধ, 'ঈশ্বরের পৃথিবীতে নির্ভরতার কিছুমাত্র দাম নেই'—তাহলে কেন বারে বারে কবির ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ? কিন্তু কবিতা দর্শনের যুক্তিতে নেই, কবিতা শব্দের বিশিষ্ট প্রকাশে। তমিজ চৌধুরীর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে নারী, কবিতাও তাঁর কাছে নারীর চেতনায় একাকার, 'কবিতা, অন্তঃসত্তা / কবিতা মা হবে / সুখের সময় হবে।' (কবিতা দ্বিচারিণী মানচিত্র) অথচ, সেই

ব্রতকথা – তাপস ওঝা। প্রকাশক, ১৯৮৯, আট টাকা। **অন্তর্গত স্রোতের প্রতি**—তমিজ চৌধুরী। মোনালিসা, ১৯৮৯, বাইশ টাকা। **ভালোবাসার কথা**—নাজিম মাহমুদ। পরমা প্রকাশনী, ১৯৮৯, পঁয়ত্রিশ টাকা। **সেই উন্মোচন**—রমেন আচার্য। বইঘর, ১৯৭২, চার টাকা। **মোহরের জন্য ভূমি** রমেন আচার্য। আত্মপ্রকাশ ১৯৮২, চার টাকা। **আতঙ্ক ও অন্যমনস্কতা**—রমেন আচার্য। আভাসিনী প্রকাশন, ১৯৮৪, সাত টাকা। **আপাতত একটু রোদ্দুর**— বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়। সময়ম্, ১৯৮৮, পাঁচ টাকা। **যা ভূত তুয়ো তুয়ো**—সুদেব বক্সী। শৈব্যা, ১৯৮৮, আট টাকা।

মায়ের রূপকল্পে যাকে চিহ্নিত করতে চান, তার সম্পর্কে কবির উপলব্ধি, 'আমি বুঝি না বুঝি না / নারী আর রমণীর ভেদাভেদ বুঝি না / ক্যাবোলই নারীকে তালা দেওয়া পুতুল ভাবি / কড়কড়ে নোটে কেনা যায় তার চাবি'—এই রুগ্‌ণ বোধ, মবিডিটি কবির অন্তর্গত স্রোতের মধ্যে আদি-অন্ত বহমান থাকে, তাই কবি শেষ করেন 'আমি টলছি, এবং কাঁপছি / স্রোত তুমি মৃত্যু এড়াতে পারো নি ?' তমিজ চৌধুরীর ঝোঁক উচ্চারণ-অনুসারী বানানের দিকে—ক্যানো, হ্যাখো, ক্যামোন, য্যামোন, কখোনো, ক্যাবোল (কেন, দেখ, কেমন, যেমন, কখন, কেবল) প্রভৃতি শব্দ, আমি যতদূর জানি, বাংলাদেশের শিষ্ট ভাষাতেও গ্রাহ্য নয়, আর কবি ভাষার শিল্পী হলেও, তাঁর স্মরণে থাকতে হবে যে, ভাষা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তা সামাজিক। আর-একটি কথা, গ্রন্থের পঞ্চম কবিতাটি, 'নিষিদ্ধ প্রেম হে গন্দর্ভ নারী' সূচীপত্রসহ পাঁচবার "গন্দর্ভ" লেখা হয়েছে, শব্দটির অর্থ কোনও অভিধানেই পেলাম না।

নাজিম মাহমুদের "ভালোবাসার কথা" কাব্যগ্রন্থটি পড়ে ভালো লাগে। প্রতিটি আট চরণের কবিতা, চুয়াল্লিশটি কবিতার সংকলন, বা বলা যেতে পারে চুয়াল্লিশটি আট চরণের স্তবক মিলে একটি দীর্ঘ কবিতা। যেমন জীবনানন্দের "রূপসী বাংলা"। অবশ্য রূপসী বাংলার যে অননুকরণীয় স্বপ্নালু নসটাল-জিয়ার তন্দ্রাচ্ছন্নতা, নাজিম মাহমুদ তার অনুকরণ করেন নি। কিন্তু বিষয়গত পূর্বাপর একই বোধ, ভালোবাসা—এ কবিতার বহতা উপাদান। সচেতনেই কবি জীবনানন্দের থেকে ভিন্ন পথ নিতে চান, তাই লেখেন, 'ভালোবাসা যদি পাই শ্রাবস্তী নাই মুখে থাকলো / বিদিশার নিশাহীন না হয় সে চুল বেঁধে রাখলো / ভালোবাসা যদি পাই কাজল সে নাই চোখে আঁকলো / দুই ঠোঁটে নাই বা সে আঙুরের রঙটুকু মাখলো /' —কোনো এক প্রেমিকার দিকে স্থিরলক্ষ্যে কবি যেন কবিতাগুলি রচনা করে চলেন, এবং এক তৃপ্তিবোধ চারমাত্রার হালকা চালের পর্বে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর পরিণতিতে কবির সে ভালোবাসা স্বদেশ ও স্বকালে ব্যাপ্ত হয়ে যায়,

প্রাতরাশ টেবিলের টকটকে কুসুমের মতো
একটি সকাল যদি স্বদেশে স্বকালে আজ হতো
উড়ন্ত পারাবত ঠোঁটে নিয়ে জলপাই পাতা
একটু বসতো যদি উঠোনে জলে পিড়ি পাতা
হাতুড়ি কাস্তে যদি যৌবনে ভরে দেয় দেশ
ভালোবাসি সেই সুখ নবান্ন শান্তি আবেশ
ভালোবাসি সারাদেশে মানুষের স্পর্ধিত ছায়া
যা দেখে পালায় যত শ্মশানের শকুনী বেহায়া

শ্রমের অবসরে পাঠক এ কবিতা নিশ্চয় পড়তে চাইবে, কিন্তু চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার বই ৩৫ টাকায়—ভালোবাসার কথার দাম যে বড্ড বেশি হয়ে যায়, ভারতীয় টাকাতেও আটাশ টাকা কম করে। এত দামে কি ভালোবাসার কথা ছড়িয়ে পড়তে পারবে ?

রমেন আচার্যর যথাক্রমে তিনটি গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে : 'সেই উন্মোচন', 'নোঙ্গরের জন্য ভূমি' এবং 'আতঙ্ক ও অন্যমনস্কতা'।

রমেনের কবিস্বভাবের বিবর্তন গ্রন্থনামের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বিধৃত।

মোট চুয়ান্নটি কবিতা 'সেই উন্মোচনে' সংগৃহীত হয়েছিল এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের সূচনাতেই পরিণত আঙ্গিকসচেতন এক কবির পরিচয় আমরা পেয়ে যাই। কেননা, কবি বুঝে নিয়েছেন 'কম্পিত দুর্বল হাতে লক্ষ্যভেদ দারুণ কঠিন। / কবিতার শূন্য মাঠে রণাঙ্গন। / তূণেতে সজ্জিত আছে মন্ত্রপূত অলৌকিক তীর।' আট ও দশ মাত্রার পর্বের এই প্রবহমানতা রমেনের কবি-স্বভাবের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। কিন্তু উদ্ধৃত কবিতাটির (যদি শব্দ হয়) প্রথম পংক্তিতে 'তীক্ষ্ণতম শব্দ ছুঁড়বো তাক করে সুরক্ষিত বুক'—সহজেই কানে ধরা পড়বে যে আট-দশ মাত্রার নির্দিষ্ট মাত্রাগত বিন্যাস এখানে ভেঙে গেছে, যুগ্ম ধ্বনিকে ভেঙে উচ্চারণ করলেও মাত্রা-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্রবহমানতার সৌন্দর্য ফোটে না। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও রমেন কবি। চিত্রকল্প নির্মাণে কষ্টকল্পনা ছাড়াই কবি সংক্ষেপে দৃশ্যাবলী সজ্জিত করতে পারেন, 'ওপারে দাঁড়িয়ে তুমি অন্ধকারে / মুক্তকেশ ঝড়ের হাওয়ায় / এলোমেলো। / শব্দের প্রদীপগুলি নিভে যাচ্ছে। প্রিয় ডাকনাম / তোমাকে ধরতে গিয়ে ডুবে যায় গভীর সাগরে।' কিন্তু ছন্দ সম্পর্কে পূর্বোক্ত অসতর্কতা আরো লক্ষ করা যাবে, 'স্বপ্নে দ্বিতীয় ভুবনে / জেগে প্রায়ই আমি কঠিন কাজের মুখোমুখি।'—প্রথম পর্ব মাত্রা-সংখ্যায় মোট আটমাত্রা-বিশিষ্ট হলেও তিন + তিন + দুই-এর প্রচলিত ক্রমের দুই + তিন + তিন ক্রমে বিন্যস্ত করে ধ্বনির সমতা আসে নি পরবর্তী পংক্তিগুলির সঙ্গে। অথচ সাবলীল বলিষ্ঠ পংক্তি রচনার ক্ষমতা রয়েছে রমেনের। যে সমস্ত পংক্তি স্মরণীয় থাকতে পারে, 'এরা কবি, বিবাহিত, অথচ স্বপ্নের প্রেমে গড়েছেন দ্বিতীয় সংসার।' কিংবা, 'অবশেষে একদিন ফুল হাতে সুধা এসে ডাকে / নীল সরোবরের স্বপ্ন দুই হাতে বয়ে আনে পঁচিশে বৈশাখ।' বা 'ড্রাইভারের পদতলে আহত বাঘের লেজ ফোঁসে।' রমেনের কবিতায় সূচনায় প্রেম সম্পর্কে অবিশ্বাস লক্ষ করা যাবে, যেমন, 'এভাবেই শরীরে ভ্রমণ, / চন্দন বনে ও হাওয়ায় নিঃশ্বাসে, গভীর সবুজ বনে / এভাবেই ছুটে যায় আত্মসমর্পণ / ঘুম ভেঙে গেলে / তালুহীন হাত থেকে ঝরে যায় প্রেম ও পিপাসা।' অথবা 'সাড়ে ছ আনার দোকানে / সুমিতা, আবার কিনো ইচ্ছেমত প্রেম ভালোবাসা।' কিন্তু এই বোধ স্থায়ী হয় না। কবি অনুভব করেছেন, 'হারানো জীবন এসে ভালোবাসামাখা হাতে তুলে নেয় জ্বর।'

প্রকৃতির চেয়ে মানুষ এবং ভাব (আইডিয়া) রমেনের কাব্যের প্রধান অবলম্বন, তাই মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসায় রমেনও সুর মিলিয়ে বলেন, 'তুমি কি ঈশ্বর হবে—সত্যিকার জীবন্ত ঈশ্বর ? / কারণ জীবন বড় ক্লান্ত মনে হয়, একটা বিশ্বাসের আজ প্রয়োজন, বড়ো প্রয়োজন / এই মুগ্ধ নির্ভরতা, স্থির বিশ্বাসের' (জাদুকর) এই অবিশ্বাস ও বিশ্বাসের স্থিতভূমির সন্ধানের মধ্যেই কবির নাগরিক মন প্রকাশিত হয়, লক্ষ করেন, "ডালহৌসী-চৌরঙ্গীর সভ্যতার মৃতদেহের উপর / অন্ধকার অরণ্যে / আফ্রিকার আদিম হিংস্রতা,' 'অথবা কখনো এসপ্লেনেডের রাস্তায় ভীড় কিংবা নিওনের তাপে / তুমি যদি হয়ে যাও আমাদেরই মত কালো ম্লান, / আমাদেরই মত হাসো, রেসটুরেনট আলো করে যদি / পাশে বসো, দু' একটি ইংরেজী শব্দের উচ্চারণে যদি হও কালের সঙ্গত'—এ-নাগরিক অবিশ্বাস যেন সমর সেনের মতোই লুপ্ত রোমানটিকতার জন্যে হাহাকার। তাই রোমানটিক জগতেই কবি ফিরে যেতে চান—'তার পর মৎস্য-কন্যা / শুধু নীল, নীলের সাগর।'—পাঠকের এলিঅটের লাভ সঙ টু জে, আলফ্রেড প্রুফ্রকের সেই বিখ্যাত পংক্তি মনে পড়ে যেতে পারে **'I have heard the mermaid singing each to each........when the wind blows the water white and black.'**

সমকাল ও সাময়িকতা রমেনের কবিতায় প্রত্যক্ষ-ভাবে আসে না, সাময়িকতার উপস্থিতি এখানে পরোক্ষ, 'এখনো এমনি…প্রতিদিন মুখের ভাঁজে বয়সের থাবা / যাচ্ছে বসে, সজ্ঞানে পকেটমার হয়ে যাচ্ছে সব রোজগার।' বা 'ট্রামে বাসে আকাঙ্ক্ষার পাদানিতে অদ্ভুত কৌশলে / পা গুঁজে দীর্ঘপথ নিরুদ্বেগে চলে যাওয়া যাবে। / … গীর্জার শীর্ষে পূর্ণগর্ভবতী ঘড়ি চক্রাকার দীর্ঘপথে / অহরহ মৃত্যু ও প্রসবযন্ত্রণা।' শেষ দুই চরণে 'র' ধ্বনির মালানুপ্রাস লক্ষ করার মতো। সেই উন্মোচনের বেশ কিছু কবিতা পাঠকের ভালো লাগবে।

আটত্রিশটি কবিতা নিয়ে রমেন আচার্যের দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন, "নোঙ্গরের জন্য ভূমি"। এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী "সেই উন্মোচন" সংকলনের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যাবে। এই গ্রন্থে প্রকৃতি তুলনামূলক-ভাবে আগের বইটির চেয়ে অধিকতর প্রাধান্যে উপস্থিত। 'নোঙ্গর' শব্দে জলের অনুষঙ্গ মনে আসে, কিন্তু এ-বইতে বারে-বারে পাহাড়ের অনুষঙ্গ এসেছে (২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৪ সংখ্যক কবিতায়)। বোধ হয় ফেলে-আসা চট্টগ্রামের পাহাড় ও সমুদ্র সমন্বিত প্রকৃতিকে পিছনে ফেলে রূপকার্থে এ-বঙ্গে নতুন আশ্রয়ের নোঙর ফেলেও কবি ছেড়ে আসা প্রকৃতিটির নস্টালজিক অবচেতনায় আচ্ছন্ন থাকেন। কিন্তু আত্মবিশ্বাস এখানে দৃঢ়তর, কবি বলতে পারেন, 'ভীরু ও লাজুক পোষাক ফেলে ঘোড়া নিয়ে এসেছি বিজয়ী তার কাছে।' এই গ্রন্থেও বেশ কিছু কবিতা ফিরে পড়তে ভালোই লাগবে—দাঁতে কাটে নীল খাম, সহসা চতুর্দিকে, শিখেছে মনুষ্য ভাষা, অরণ্য থেকে, মাদুর বিছিয়ে, শালবন ও আরো কয়েকটি কবিতা।

পঞ্চান্নটি কবিতা নিয়ে রমেনের তৃতীয় গ্রন্থ "আতঙ্ক ও অন্যমনস্কতা"। এই গ্রন্থে এসে কবি যেন পায়ের তলায় জমি পেয়েছেন, 'একদিন এই দেশে / কোথাও এমন নীলাভ পুষ্পের পাশে / থেমে যাবে তোমার ভ্রমণ।' এখানেও চিত্রকল্প নির্মাণে রমেনের দক্ষতা লক্ষ করা যাবে, 'মানুষের চেতনায় লাল খুব দপ করে জ্বলে, / সাদারক্ত ঝরে পড়ে অভিমানী মোমের মতন।' অথবা, 'একদিনের আলোয় জেগে / নিভে যায় শিল্পীর প্রতিমা। অশ্বত্থতলায় বৃষ্টি / দাঁতে কাটে রং মাটি খড়।' এ গ্রন্থে আবার যেন নাগরিকতার চেয়ে নিসর্গের অনুষঙ্গের প্রতি কবির তুলনামূলক আকর্ষণ বেড়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে আত্মকথনের এক মসৃণ রীতি। নোঙ্গরের জন্য ভূমি খুঁজতে কবি রমেনের যে যাত্রা, সেই যাত্রাপথে নোঙ্গরের ঠাঁই মেলে না, কবি দেখেন 'মানুষের ছিন্ন-ভিন্ন বিকৃত মুখ ও তার পাশে ঝুলে থাকা এই প্রশ্নের / অন্যমনস্কতায় আমি দীর্ঘ কয়েক মাইল চলে আসি / ··· এ সবের কোন উত্তরই জানা নেই আমার। শুধু চা-বাগানের পাশে / শুয়ে থাকা এই দীর্ঘ পথটি প্রতিবারই আতঙ্ক ও অন্যমনস্কতায় / কেটে যায়।' মনে হয় রমেন উপলব্ধি করেন কবির কোথাও শেষাবধি নোঙরের ভূমি নেই, আর আতঙ্ক ও অন্যমনস্কতার সম্পর্কে মনস্ক হয়ে উঠলেই কবির ভাবনা ও প্রকাশের আঙ্গিকের নতুনতর পথের সন্ধান করতে হয়। হয়তো রমেন পরবর্তী গ্রন্থে সেদিকেই পদক্ষেপ করবেন।

আটাশটি কবিতা নিয়ে বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের "আপাতত একটু রোদ্দুর" কাব্যসংকলন। কবির বক্তব্য জানা যায়, গত দশ বছরে রচিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে এই সংকলন। ছোট ছোট পর্বে, ছোট স্তবকে কবি বিশ্বরূপ তাঁর কবিতার ভাবনাগুলি সাজান, যেমন, 'সে দেখেছে, / ঋতু বদলানোর মেঘের সঙ্গে / সময়ের দিব্যি ভাব খুনসুটি / জলের সঙ্গে বাতাসের / পত্রমিতালী।' দু-তিনটি শব্দে চিত্র তৈরি করতেও বিশ্বরূপ দক্ষ, 'ঝাঁপিয়ে কুঁড়ি আসে / চুলের রূপোলি পাকে / হারিয়ে যাওয়ার ভয় / ক্রমশই শিকড় ছড়ায়।' ছড়ার ছন্দের হালকা চালেও করি সিদ্ধ, 'স্বপ্ন ছিল কিশোর যখন, স্বপ্নে ছিল রতি / অবাক দৃষ্টি ছিল তখন ছিল না দুর্মতি।' কিন্তু গদ্যের ঢঙে কথা বলাতেই মনে হয় বিশ্বরূপ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বেশি। অধিকাংশ কবিতাই নরম, পেলব—'সকালের আধখানা রোদ / অনিমেশের খাটে / সাত্রর বই তখনও খোলা / ও ভাবছিল সঙ্গীতের কথা / কাল ওসব কথা না বললেই—' বাক্যবন্ধ এখানে অসমাপ্তই থাকে, আভাসে পাঠক যা বুঝে নেবে, তাতেই কবি যেন তৃপ্ত। কোনও গুরুগম্ভীর বক্তব্য বিশ্বরূপের কাব্যে পাওয়া যাবে না; রাজনীতির, মতাদর্শের জটিল পক্ষপাতও তাঁর

কাব্যে নেই। শুধু স্বীয় অনুভবের ছবি, প্রেমের লঘুচপল স্মৃতি, ভালোলাগার আভাস—এসবই তাঁর কাব্যের উপজীব্য। এবং উষ্ণতাটুকু পেলেই তৃপ্ত, 'তুমি চলে যাও / আমি কিছু চাই না / শুধু চাই / আপাতত একটু রোদ্দুর।' সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিশ্বরূপের কবিতার শাশ্বত মূল্য নিরূপণে দু'দিকেই মাথা নাড়বেন কিনা, তাঁরাই তা বলতে পারেন, কিন্তু বিশ্বরূপের ঘনিষ্ঠ আপন বন্ধুস্বজনের কাছে এ-কবিতাগুলি ভালো লাগারই কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে ছাপা-কাগজ-বাঁধাই ভালো, কিন্তু হলুদের ওপর লাল অক্ষরের প্রচ্ছদ আমার চোখে ভালো লাগে নি, নাকি লাল অক্ষর বাধ্য-বাধকতার অন্তর্গত?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্য পেয়েছে সুদেব বক্সীর "যা ভূত ছুয়ো ছুয়ো" নামে ছড়ার বইটিও। সুব্রত চৌধুরীর অলংকরণ ও প্রচ্ছদও ভালো। ছড়ার বইতে যে চার মাত্রার চাল, তা এখনো সুদেব বক্সীর সম্পূর্ণভাবে করতলগত নয়, 'মাঝে মাঝে / বড় বেশী / ভেবে ফেলি / তা নিয়ে' চার+চার+চার+তিনের অপূর্ণ পর্বের চরণের আগের চরণেই 'গল্প যা / বল মাগো / বানিয়ে ও / বানিয়ে'তে মাত্রাসংখ্যা হয়ে যায় তিন+চার+চার+তিন মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। ফলে স্বভাবতই প্রথম পর্বে তাল কাটে অথবা উচ্চারণ বিকৃত করে 'গলপ যা' পড়ে মাত্রা রক্ষা করতে হয়। এরকম আরো উদাহরণ তোলা যায়। কিন্তু সুদেবের মধ্যে ছড়ার এক সহজ প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যেমন, 'চ্যাং বললো ব্যাঙকে / যা তো দেখি ব্যাঙে / ব্যাঙ্ক ডাকাতি আনতো করে / উঠবো ওপর র‍্যাঙ্কে।' ছন্দের গণিত এমন কিছু আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়, সেদিকে উন্নতি করলে সুদেবের ছড়া সমৃদ্ধই হবে।

মতামত

ডারউইনবাদের ত্রুটি এবং জীবন-সংগ্রামের প্রকৃত অর্থ

অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী "মার্কসবাদ ও জীবন-সংগ্রামতত্ত্ব"-শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের যে তুলনামূলক ও আকর্ষণীয় সমালোচনা করেছেন, তা বাস্তবিকই মূল্যবান। জীববিবর্তনের ক্ষেত্রে বংশগতি (heredity), বৈচিত্র্য (variation), প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection), যৌন নির্বাচন (sexual selection), জীবনরক্ষার সংগ্রাম (struggls for existence) এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) —এই ছয়টি ডারউইন-কর্তৃক আবিষ্কৃত নিয়ম যে কার্ল মার্কস ও সমকালীন অনেক দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, এ বিষয়ে অতীতেও বহু আলোচনা হয়েছে। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে, ডারউইনবাদকে নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজ-নিজ স্বার্থ আর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন; যেমন, জীব-জগতে প্রতিযোগিতার তত্ত্বকে পুঁজিবাদী খোলা-বাজার, অবাধ বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতার সমর্থনে দাঁড় করানো হয়েছে, কার্ল মার্কস ডারউইন-আবিষ্কৃত জীবনরক্ষার সংগ্রামের নিয়মকে শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন, আবার যোগ্যতমের উদ্বর্তনের নিয়মকে কাজে লাগিয়ে ফ্যাসিস্টরা (বিশেষত হিটলারের নাৎসি পার্টি) শ্রেষ্ঠ জাতির চূড়ান্ত বিজয়ের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। লেখক আরও দেখিয়েছেন যে, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ-বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে অনেক নতুন ব্যাপার জানা গেছে যার ফলে 'ডারউইনের মতবাদের জের টেনে জাত্যভিমান, জাতিশ্রেষ্ঠত্ব, অভিজাততন্ত্র কিংবা ফ্যাসিবাদ প্রতিপন্ন করা চলে না। অন্যদিকে কেবল শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বও ডারউইনবাদ থেকে নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত হিসাবে টানা চলে না।'

এইসব নতুন ব্যাপার সম্পর্কে লেখক সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন পরিবেশবিজ্ঞানের উপর এবং বলেছেন যে পরিবেশবিজ্ঞান আজ নির্দেশ করছে যে মানুষকে বেঁচে থাকতে গেলে লড়াই করলেই চলবে না, আপোস করতে হবে, পরিবেশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। লেখকের মতে—বর্তমান কালের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি, সমগ্র মানবসমাজের ঐক্যের নীতি এবং শান্তিপূর্ণ পথে সমাজপরিবর্তনের আদর্শ পরিবেশবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রযুক্তিগত পূর্বশর্ত না থাকার দরুনই ডারউইনের সূত্র ধরে "বাঁচার লড়াই"-এর নিয়ম বা "শ্রেণীসংগ্রাম" এ যুগে আর ফলপ্রসূ হবে না।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর চিন্তাধারার সঙ্গে কোনো মৌলিক বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও মনে করি দুটি প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত হয় নি। প্রথম প্রশ্ন, ডারউইনবাদই জীববিবর্তনের ক্ষেত্রে সঠিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কি না, অর্থাৎ জীববিবর্তনের প্রকৃত রহস্য ডারউইন উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছিলেন কি-না, অথবা তিনি বিবর্তনের কতগুলি secondary causes আবিষ্কার করেছিলেন? এই প্রশ্ন সম্পর্কে সতীনবাবু কিছু বলেন নি, যদিও তিনি বলেছেন, 'একুশ শতকের জগতের প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছে আজ আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত—ডারউইনের মত-বাদ তখনকার সমাজে কতখানি বিপ্লবই না এনে দিয়েছিল।' কিন্তু প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ একথা কারুর অজানা নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে সমাজের ইনটারঅ্যাকশন দ্বারা আজ মানুষের অগ্রগতি এবং বিকাশ ঘটছে। কিন্তু সেগুলি সবই মানুষেরই আবিষ্কার—যে মানুষ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে হচ্ছে 'এ থিঙ্কিং অ্যানিমল'। কাজেই জীববিজ্ঞানের সত্য-গুলি মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য, কিন্তু বাড়তি অনেকগুলি সত্য আছে যা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের ক্ষেত্রে নেই। ডারউইনের বিবর্তনবাদ যদি জীবজগতের মূল নিয়মগুলিকে প্রকাশ করে থাকে, তাহলে মানব-সমাজের ক্ষেত্রে সেইগুলি প্রযোজ্য হবে না কেন—মানুষ তো জীবজগতের বাইরে নয়, বরং তারই একটি অংশ। ডারউইনবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতীতে মূলধনী অবাধ প্রতিযোগিতার প্রবক্তাদের, কার্ল মার্কস এবং শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তাদের এবং হিটলারের ভুল হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ডারউইনতত্ত্ব যদি জীবজগতের মূল নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করেছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে প্রযুক্তিগত পূর্বশর্তের নতুনতর অবস্থায় আবার তাকে প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সুযোগ আসবে। সুতরাং ডারউইনের বিবর্তনবাদের সমালোচনা না করে শুধু শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের বা সমাজের ক্ষেত্রে ডারউইনতত্ত্বের অপপ্রয়োগের সমালোচনা করলে আসল জায়গায় ফাঁক থেকে যায়।

ডারউইনের জীববিবর্তনবাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা বা ত্রুটি হল বংশগতির (heredity) নিয়ম-গুলি—অর্থাৎ যেসব নিয়মে ব্যক্তির, পরিবারের, প্রজাতির এবং জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংরক্ষিত হয় (কখনও প্রকাশিত, কখনও অপ্রকাশিতভাবে), বিকাশলাভ করে, আবার নানা বৈচিত্র্যের এবং কখনও-কখনও মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে—সেগুলি ডারউইন আদৌ ধরতে পারেন নি। তিনি শুধু এইটুকু বুঝেছিলেন যে, প্রত্যেক জীবদম্পতির সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় সেইগুলি তাদের উত্তরাধিকারীরা অর্জন করে। তাঁর এই ধারণাটাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কী ধরনের বৈচিত্র্য উত্তরাধিকারীরা অর্জন করে, কেমন করে বৈচিত্র্যগুলির সৃষ্টি হয়, কোন্ প্রজাতিতে সেগুলি অর্জিত হয়, কেমন করে জীবের বৈশিষ্ট্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে—এসব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তাঁর জানা ছিল না। যদি জানা থাকত তাহলে ডারউইন কখনই অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন ইত্যাদির মতো বিবর্তনের এম্পিরিক্যাল কারণ-গুলিকে মূল কারণ হিসাবে গণ্য করতেন না—এই-গুলি বড়জোর গৌণ শর্ত বা সেকেনডারি কনডিশন হিসাবে পরিগণিত হত। কিন্তু ডারউইন তাঁর অজ্ঞতার ফলে কতকগুলি গৌণশর্তকে বিবর্তনের মূল বা প্রাথমিক শর্তরূপে স্থির করেছিলেন—যার থেকে এল মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব এবং আধুনিক মার্কস-বাদীদের লড়াই-লড়াই-লড়াই চাই স্লোগান। তাই ডারউইনতত্ত্বের ত্রুটি বা ভ্রান্তিই অবাধ প্রতিযোগিতার প্রবক্তাদের, কার্ল মার্কসের এবং হিটলারের ভুলের উৎস।

উনিশ শতকের বিজ্ঞানজগতের মধ্যে যদি আর-একটু সময়য় (কো-অর্ডিনেশন) থাকত তাহলে হয়তো ডারউইন তাঁর ত্রুটির সংশোধন করে ফেলতেন। কারণ ১৮৫৯ সালে ডারউইনের "অরিজিন অভ স্পিসিজ" প্রকাশিত হবার পরের বছরই বংশগতির রহস্য সম্পর্কে সঠিক পথে পরীক্ষামূলক গবেষণা আরম্ভ হয়েছিল এবং ১৮৬৯ সালে অস্ট্রিয়ার এক অখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তৎকালীন জীববিজ্ঞানে যে সত্যকার বিপ্লব ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ ছাপা হয়েছিল। প্রজননবিদ্যা বা জেনেটিক্সে এই বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন গ্রেগর মেনডেল (১৮২২-১৮৮৪) নামে এক আরও অখ্যাত খ্রীষ্টান সাধু। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ডারউইন আর মার্কস এর

সমসাময়িক হলেও এই বিপ্লব সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর পান নি। কারণ এই পাদরিকে (যিনি দু-দুবার পরীক্ষা আর ইনটারভিউ দেওয়া সত্ত্বেও একটা প্রাথমিক স্কুলের মাস্টারি জোগাড় করতে পারেন নি) তৎকালীন দুনিয়ার বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল পাত্তাই দেন নি।

মেনডেলের তত্ত্বের বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু উল্লেখ্য যে বিভিন্ন উচ্চতার আর বিভিন্ন রঙের ফুলসম্পন্ন কড়াইশুঁটি গাছের কলম বেঁধে নতুন বীজের সৃষ্টি করে এবং সেগুলি থেকে নতুন ধরনের গাছ তৈরি করে তিনিই সর্বপ্রথম বংশগতির নিয়মগুলিকে গাণিতিক সূত্রে বেঁধে দেন। মেনডেলের আবিষ্কার ৩২ বছর পরে (১৯০০ সাল) প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে, কারণ তিন দশক ধরে ডারউইনবাদের প্রবক্তাদের প্রচারের ফলে (যে প্রচারে বিজ্ঞানের তুলনায় ভাবাবেগই ছিল প্রধান) জীববিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের দিশারি এই বৈপ্লবিক আবিষ্কারটি ধামাচাপা পড়েছিল। আজ যে মলিকিউলার বায়োলজি গড়ে উঠেছে তার সূত্রপাত হয় মেনডেলের আবিষ্কার থেকে। মেনডেলের পর যাঁরা বংশগতি আর বিবর্তনবাদের এই নতুন ধারাকে নব-নব আবিষ্কারে সমৃদ্ধ করেন তাঁরা হলেন ১৯০২ সালে মিউটেশন তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হুগো দ্রভ্রিয়েস (১৮৮৪-১৯৩৫), ১৯২৭ সালে রঞ্জনরশ্মির প্রয়োগে যিনি জীন মিউটেশন ঘটিয়েছিলেন সেই হারমান মুলার এবং চল্লিশের দশকের শুরুতে ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজির বিজ্ঞানী টমাস হান্ট মর্গান (১৮৬৬-১৯৩৫) এবং তাঁর সহকর্মীরা। এরপর আভেরি, ম্যাকলিয়ড, ম্যাককার্টি, ওয়াটসন, ক্রীক এবং উইলকিনস, কর্নবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন।

এইসব আবিষ্কারের দ্বারা আজ জানা গেছে যে, জীবকোষের অন্তর্গত ক্রোমোসোম এবং তার মধ্যে অবস্থিত ডি. এন. এ. এবং জীন প্রত্যেক জীবের লিঙ্গ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি। জীনের মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় অব্যাহত থাকে। জীনের পরিবর্তন ঘটলে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে এবং যৌনমিলনের দ্বারা যে ভ্রূণ-উৎপাদন হয় তাতে পিতা আর মাতার জীন সন্তানে সংস্থাপিত হয়। এই সংস্থাপনে কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটানো যায়। তা ছাড়া খাদ্য, রাসায়নিক, রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদির প্রভাবে এবং অনেক সময় অজ্ঞাত কারণে জীবদেহের জীনের পরিবর্তন ঘটে। এই ডি. এন. এ. এবং জীন হল জীবকোষের তথা জীবদেহের হর্তাকর্তাবিধাতা। মানবদেহের অন্তর্গত লক্ষ-কোটি জীবকোষের (জীবকোষগুলি সর্বদা ভেঙে যাচ্ছে এবং নতুন কোষ গড়ে উঠছে) প্রত্যেকটিতে রয়েছে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোম অণুবীক্ষণে দেখলে সুতোর মতো দেখায়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের শিরদাঁড়ায় আছে একজোড়া পরস্পরকে পেঁচিয়ে থাকা সাপের মত (double helix structure) ডি. এন. এ.—যার দেহ গঠন করেছে শত-শত সুগার (চিনি), ফসফেট এবং তৎসহ অ্যাডেলিন থাইমিন, গুয়ানিন ও সাইটোসিন নামক জৈব অণু। এই অণুগুলি মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও ফসফরাস পরমাণু দ্বারা গঠিত। ডি. এন. এ.-র অংশ হিসাবে রয়েছে জীনগুলি। প্রত্যেক ক্রোমোসোমে মালার আকারে সজ্জিত জীনগুলি বংশগত চরিত্রের ধারক এবং বাহক। বিভিন্ন জীন ক্রোমোসোমের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ক'রে জীবের এক-একটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে—যে বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে প্রবাহিত হয়। জীনের পার্থক্য থাকায় এক জীবের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে বৈচিত্র্য ঘটে, জীনের মিউটেশন ঘটলে জীবের বৈশিষ্ট্য পালটে যায় এবং এই মিউটেশন ব্যাপকভাবে হলে ক্রোমোসোম মিউটেশন ঘটে যাতে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

এই তথ্যের আলোকে যা দেখা যাচ্ছে তা হল জীববিকাশ বা বিবর্তনের যেসব পদ্ধতির কথা ডারউইন বলেছেন সেগুলি আসলে সহায়ক শর্ত মাত্র। ওইসব পদ্ধতিতে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার কাজ চলে না বা নতুন প্রজাতির উদ্ভবও হয় না। কিন্তু প্রজননগত কারণে যদি নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা দেয় তবে সেগুলির স্থায়িত্বলাভে বা অবলুপ্তির ক্ষেত্রে ডারউইনের পদ্ধতিগুলি সাহায্য করে।

বর্তমানে প্রজননবিদ্যার অনেক প্রথম সারির বিজ্ঞানীর মতে অন্যান্য জীবের মতো মানুষের ক্ষেত্রেও জীন-ক্রোমোসোমতত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। একটি শিশু ভবিষ্যতে কী হবে, সে কালো না ফরসা হবে, লম্বা না বেঁটে হবে, মেধাবী হবে না ভোঁতা হবে, লেখাপড়া, গানবাজনা, খেলাধুলো, খুনজখম, যুদ্ধবিগ্রহ—কোনটি বা কোনগুলির দিকে তার প্রবণতা বেশি হবে, কী কী ধরনের রোগে সে সহজে আক্রান্ত হবে, স্বাভাবিক হবে অথবা হ্যাটা হবে, বাতিকগ্রস্ত, ধূমপায়ী বা মাদকাসক্ত হবে কিনা—এসবই মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির সময় প্রায় নির্ধারিত হয়ে যায়। কারণ পিতা আর মাতার জীনই সবকিছু নির্ধারণ করে। উত্তরকালে জীবনের পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা, জীবন-সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন ইত্যাদি জন্মসূত্রে লব্ধ বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনাগুলিকে পরিস্ফুট ও বাস্তবায়িত করে, অথবা ব্যাহত বা ব্যর্থ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে পারে না। ডারউইনের বিবর্তনবাদের নিয়ম অনুযায়ী জীবের নতুন বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে না এবং শ্রেণীসংগ্রাম, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন বা পরিবেশ পরিবর্তন করেও মানুষের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র সম্পূর্ণ পালটানো যায় না।

ডারউইনের উপর মার্কসের যে বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা ছিল সেটাকে অযৌক্তিক বলা যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল—মার্কসবাদীরা অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ডারউইনকেই আঁকড়ে ধরে-ছিলেন—অন্য কোনোদিকে তাকান নি। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের মার্কসবাদীদের মধ্যে ডারউইনভক্তি খুব প্রবল। এই আশ্চর্য ব্যাপারের একটি কারণ পরিষ্কার, যা হল ডারউইনবাদ বুঝলে মার্কসবাদ বোঝা সহজ হয়। দ্বিতীয় কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিন ছিলেন মেনডেল-মর্গানের জীববিদ্যার ঘোর বিরোধী। স্তালিন আমলে রাশিয়ায় জীন ও ক্রোমোসোমের উপর গবেষণাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্তালিনের স্নেহধন্য বিজ্ঞানী টি ডি লাইসেংকো আগাগোড়া লিখে গেছেন যে, মেনডেল, মর্গান ও জীনতত্ত্বের প্রবক্তারা বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদের দালাল। কারণ, তিনি নাকি পরীক্ষাগারে দেখিয়েছেন পরিবেশ বদলে দিলেই বীজের বংশগত চরিত্রকে পালটে দেওয়া যায়। লাইসেংকোর এই ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষিতে একসময় বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল। তবে এসব অন্ধবিশ্বাসীদের হাস্যকর কার্যকলাপকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনেও মোটের উপর যেটা দাঁড়াচ্ছে তা হল—ডারউইনতত্ত্বের ভ্রান্তিই মার্কসবাদের ভ্রান্ত নীতির জন্য দায়ী।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর প্রবন্ধের দ্বিতীয় বক্তব্য হল বর্তমান কালের পবিবেশবিজ্ঞান দেখাচ্ছে যে বৈরিতা ও দ্বন্দ্বের পাশাপাশি সহযোগিতা ও ঐক্যের দ্বারা প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকছে। তাই আধুনিক সমাজে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে শুধু সংগ্রাম করলে চলবে না, পরিবেশবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপোস করতে হবে। এরই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বর্তমান যুগের নীতিগুলি হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সমগ্র মানবজাতির ঐক্য এবং শান্তিপূর্ণ পথে সমাজপরিবর্তন। এই নীতিগুলির সবই গ্রহণযোগ্য হলেও একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে। প্রকৃতিতে জীবজগতের যে ভারসাম্য বজায় আছে তাতে বিভিন্ন জীবের সহাবস্থানের একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে তা ঠিকই, কিন্তু আর-একটা বড়ো

শর্ত হল যে প্রকৃতি প্রতিমুহূর্তে নির্দয়ভাবে কোটি-কোটি ভ্রূণ ও শিশুকে হত্যা করে কোনো প্রজাতির বা জাতির অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধিকে ক্রমাগত ঠেকিয়ে রেখেছে, যার ফলে এই ভারসাম্য বজায় আছে। তাছাড়া প্রকৃতিতে খাদ্য-খাদক-সম্পর্কের ভিত্তিতে যে খাদ্য পিরামিড গড়ে উঠেছে, তাতেও কোনো জীবের সংখ্যাধিক্য হলে কিছুকালের মধ্যে তার খাদ্যে টান ধরছে এবং খাদ্যাভাবে আবার তার সংখ্যাহ্রাস ঘটছে।

কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায়ের ব্যবস্থা খাটছে না। মানুষ খাদ্যপিরামিডের মাথায় বসে আছে, অবাধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে এবং তার ফলে খাদ্যাভাব, জলাভাব, খনিজের অভাব, কৃষি- ও চারণভূমির অভাব, বনের অভাব ঘটছে; অন্যদিকে পরিবেশদূষণ বাড়ছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা এইসব অভাবের কিছুটা কৃত্রিম উপায়ে মিটবে বা নিয়ন্ত্রিত হবে, এবং পরিবেশদূষণও হ্রাস করা সম্ভব। কিন্তু জনসংখ্যা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে সংকটকে হয়তো কিছুদিন দূরে ঠেলে রাখা যাবে, কিন্তু তার নিরসন হবে না। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি সমস্যা আছে—যা হল মানুষের অন্তর্নিহিত আগ্রাসী লোভ, হিংসা, আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি, দমননীড়নের দ্বারা নিজের স্বার্থ রক্ষার নেশা। এই পাশব প্রাকৃতিগুলি আমাদের আদিম ইতিহাসের রেস মেমারি যা জীন মারফৎ বংশপরম্পরায় সংরক্ষিত হয়েছে। প্রজননবিদ্যার আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা মনুষ্যেতর জীবের চরিত্রকে বদলানো যায়, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা কি সম্ভব? কাজেই মানবতাবাদ, সহাবস্থান, অহিংসা, আন্তর্জাতিক ঐক্য, শান্তি ইত্যাদি মহৎ আদর্শ হলেও সমস্ত মানুষ কখনই এগুলিকেই চাইবে না—একদল চাইলে একদল বাধা দেবে। সুতরাং এইসব আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলেও সংগ্রাম করতে হবে—তা না হলে আজ যতটুকু হয়েছে যে কোনো দিন তা ধূলিসাৎ হয়ে যেতেও পারে। তাই শ্রেণীসংগ্রামের ভবিষ্যৎ যাই হোক, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির, পরিবারের, জাতির ও সারা মানবজাতির উন্নত জীবনের জন্য সংগ্রাম চলবেই।

অসিতকুমার রায়
রীডার, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা।

ভ্রমসংশোধন

অগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাভারতকথা" নিবন্ধে কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে।

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬৪	১	১২	উর্বশী	মেনকা
২৬৫	১	৪	ঋক্ষ	ঋক্ষ
	২	২২	বিনহু	বিণহু
২৬৭	২	৩০	অবলোক	অবলোকন
২৬৮	১	৭	ন চঃ নিবৃত্তিঃ	নচমে নিবৃত্তিঃ
	২	২৫	থেকে।	থেকে !
২৬৯	২	৫	ব্যূহবাদ	ব্যূহবাদও
২৭০	১	২৪	নৃকুল	নৃকুল

THE JOY OF ENERGY

We try to give it to all those who labour with us to give the nation its most important and economical commercial energy resource COAL. More and more is being done to improve the living & environmental conditions of the miners who work day in and day out to keep wheels of the economy moving.

COAL INDIA LIMITED
10, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700 001